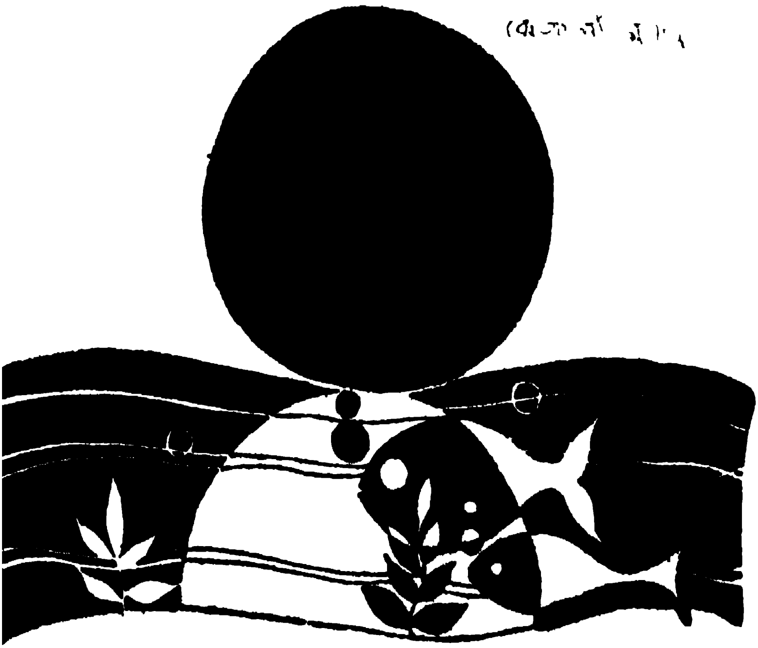
অনেক রূপোলি মাছ



সোনালি রুপোলি মাছ

অজাতশত্রু

প্যাপিরাস
৯, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

আরণ্য



[সংবাদপত্রে অবনী চট্টরাজের সংবাদ পাইলাম। প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে বেদনাবোধ করিলাম। মনে হইয়াছিল পরিণতিটা অস্বাভাবিক। আরো জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। অনিমেষ-ভায়া অবনীর অধীনে কাজ করিত। তাহাকে পত্রাঘাত করিলাম। লিখিলাম, তোমার সহিত তো তাহার পরিচয় ছিল যদি বিষয়টি সবিস্তারে জানাও তো বাধিত হই।

ভায়া আমার অনুরোধ অবহেলা করে নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তর দিয়া আমার বাসনার নিবৃত্তি করিল। পড়িয়া দেখিলাম ভায়ার পত্রটি অজ্ঞাতসারে গল্পের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া পত্রস্থ করিলাম। মনে হয় অবনী চট্টরাজ সম্পর্কে আরো অনেক কৌতূহলী আছেন। তাহাদেরও বাসনার নিবৃত্তি হইবে।

রজনী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।]

১

তিলাইয়া পাহাড় থেকে গাড়ি নেমে এল। এখন রাত অনেক। মাথার উপর রাজহংসীর ডিমের মতো চাঁদ; অঢেল জ্যোৎস্না তিলাইয়া রিজার্ভোয়ারের জল-পাহাড় আর ফরেস্টের ওপর রহস্যের ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

তিলাইয়া টাউন থেকে বেরিয়ে একটি প্রান্তর পড়ে, সেটুকু কোন মতে পার হলেই লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। তারপরই জনহীন অরণ্যরাজ্য। বাঁধঘেরা জল। ডুবোপাহাড় মাথার আধখানা তুলে পথের দিকে চেয়ে আছে। ঝোপঝাড়ে সে সব যেন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রতিকৃতি।

হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলেন চট্টরাজ। আজ যেন একটু বেশি নেশা লাগছে। জড়িয়ে আসছে চোখের চেতনা। তবু সজাগ থাকতে হচ্ছে। পথের সীমানা ছুঁয়ে জল কাঁপছে। পথের রেখাও পাহাড়ের গা-ঘেঁষে মুহূর্তে বাঁক নিয়েছে। একটু অসাবধান হলেই পাহাড়ের গায় লেগে গাড়ি রিজার্ভোয়ারের অতলে তলিয়ে যাবে। আর এমন ঘটনা চট্টরাজের জীবনে বিরল নয়। প্রাণে বেঁচে গেছেন সে ভাগ্য। দুর্ঘটনা তার হাতের চিহ্ন রেখে গেছে পায়ে। অনেকদিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছিল।

একটু বেশি সচেতন থাকতে হচ্ছে! কিন্তু ভালো লাগছে আরো বিহ্বল হতে। মনে পড়ছে সেই মেয়েটির কথা—যে রাতের দু-প্রহর পর্যন্ত চট্টরাজের বুকের তলায় নরম হয়েছিল। যার বুকের তাপ এখনো জমে আছে চট্টরাজের বুকে।

বোরির জঙ্গলের সীমানায় পাঁইয়াদের চটির পেট্রোমাক্স নিভু-নিভু হয়ে এলেও এখনো জ্বলছে। তার ফ্যাকাশে আলো বৃত্তের মতো ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে।

রাতের নির্জনতা সম্বরের চকিত ডাকে ভেঙে পড়ছে। কাছাকাছি গাছের ওপর ময়ূরের কর্কশ চিৎকার হঠাৎ জেগে উঠে থেমে যাচ্ছে।

মেয়েটার দু'চোখে কান্না ছিল। সকলেরই থাকে। হাসলেন চট্টরাজ। এরকম অনেক দেখেছেন!

কোডার্মার জল-পাহাড়ের সীমা ছাড়িয়ে বোরির বিদ্যুৎ সরবরাহ

কেন্দ্রের পাশ দিয়ে গাড়ি উড়ে চলল। রাস্তার পশ্চিমেই বিহার ন্যাশানাল পার্কের সীমানা। হাজারিবাগের খ্যাতনাম মৃগয়াভূমি। এখন নিষিদ্ধ এলাকা। চট্টরাজ সোজা ড্রাইভ করে চললেন। কনস্ট্রাক্সনের ক্যাম্প পড়েছে সিকদার পাহাড়ের পুবে। ঘন জঙ্গলে। সেখানেই যাবেন এখন।

দু'পাশের জঙ্গলের মাঝখানে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড যেন ময়াল সাপের মত এলিয়ে আছে। হাওয়া হয়ে উড়ে গেলেন চট্টরাজ।

যে বে-সরকারী কোম্পানী বিহারের এই এলাকা থেকে বনভূমি নির্বাসন দিয়ে সভ্যতা পত্তনের দায়িত্ব নিয়েছে অবনী চট্টরাজ সেই কোম্পানীর একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার। কাল ভোরে নতুন সাইটে কাজ সুরু হবে—হাজির থাকতে হবে চট্টরাজকে। পঁয়তাল্লিশ বছরের অবিবাহিত জীবনে এখনো উদ্দাম বেগ!

সাইটে নিজের ক্যাম্প আছে। দরকার মতো থাকেন। সেখানে সভ্যতার কোন উপকরণের অভাব নাই। কোম্পানীর ঢালাও ব্যবস্থা।

ক্যাম্পে হয়তো কেউ জেগে নেই। ভাবতেও পারেনি সাহেব আজই রাতে ক্যাম্পে হাজির হবেন!

এখন চট্টরাজের মনে পরম প্রশান্তি। তৃষ্ণা নিবৃত্তি পেয়েছে। মানুষের সাহচর্য ভালো লাগবে না আর। এখন অপরিচিত অরণ্য-জনপদ শ্বাপদ-অন্ধকার তার কাছে মনোরম। মনের মধ্যে যে আদিম চেতনা থাকে, গূঢ় অন্ধকার আর অরণ্যের কাছাকাছি এলে তারা যেন জেগে ওঠে। অন্ধকারে চিতার দু'চোখে যে অন্বেষণ অবনী চট্টরাজের চোখেও সেই স্বাদ জোনাকি হয়ে ওঠে।

বিলেত থেকে ফেরবার পর বনে-জঙ্গলেই কেটেছে সময়। তাই আলো থেকে অন্ধকারই ভালো লাগে।

কালো একটা অতিকায় জানোয়ারের মতো পরেশনাথ পাহাড় বাঁয়ে রেখে সামনে নেমে গেলেন।

সাবান-ঘষা চুলের মতো অন্ধকার হাওয়ায় উড়ছে।

মেয়েটার ব্যবহারে খুব হাসি পাচ্ছে চট্টরাজের। এমন রাশ-ভারি ইঞ্জিনিয়ারের যে এমন হ্যাংলামি থাকতে পারে ভাবতেই পারেনি হয়তো। প্রথমে চট্টরাজ যখন লিফ্‌ট্ দেবার কথা জানালেন তখন মুখে নেমেছিল সহৃদয় হাসি।

চলো না তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আপনি কেন কষ্ট করবেন! মেয়েটির কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

এ সব লজ্জার কোন মানে হয়! এসো। জোর করলেন চট্টরাজ। মেয়েটা পেছনের সীটে বসতে গেছিল। পাশের সীটে টেনে নিলেন চট্টরাজ। গাড়ি তিলাইয়া পাহাড়ের ঘোরানো পথে গড়িয়ে চলল।

মেয়েটি অনেক কষ্টে একবার বলেছিল, আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

যাক না। হারিয়ে যাচ্ছি নাতো?

অন্ধকারে গম্ভীর থমথমে মুখ চট্টরাজের। দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদন। চট্টরাজের মনের ইচ্ছাটা কোডার্মার মসৃণ পথে শ্বাপদের মতো শিকার মুখে নিয়ে ছুটে গেল।

সো লাভ্‌লি!

কী?

তুমি।

য়ুড্‌ য়ু মাইণ্ড্‌ এ কিস্‌? সামনের দিকে চোখ রেখে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাগুলো ভাসিয়ে দিলেন চট্টরাজ।

গাড়ি ততক্ষণে সদর ছেড়ে বনের মধ্যে নেমে গেছে। দুপাশের অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পথের উপর।

মেয়েটা কিছু বোঝার আগে গাড়ির গতি থেমে এসেছে। আলো

নিভে গেছে। চট্টরাজের অবয়বে ভালুকের আকৃতির পরিলিখন এসেছে।

একটুখানি ঝটপট শব্দ। বিস্তীর্ণ অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় একেবারে মূল্যহীন। তারপর সব চুপচাপ!

কতোক্ষণ বাদে সিগারেট জ্বলে উঠল চট্টরাজের মুখে। কয়েকটা সংলাপও। যার মধ্যে ইনক্রিমেন্ট লিফ্ট ইত্যাদি গুটিকতক কথা অসংলগ্ন আন্তরিক হয়ে উচ্চারিত হল। ব্যাগেও কয়েকখানা তিন অঙ্কের কারেন্সিপত্র পুরে দিলেন। চট্টরাজ যা পান তার দাম দেন।

অবনী চট্টরাজ নিজে এটা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই আদিম জড় চেতনার আকস্মিকতা তার সমস্ত প্রতিবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অনেক সময় অসহায় বোধ করেন তিনি। তার ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্য পদমর্যাদার মুখোস ফেলে যে মানুষটি বেবিয়ে আসে সেই কি আসল! তার কাছে কি সভ্যতার প্রসাধনে মিনে-করা চট্টবাজ বারংবার আত্মোৎসর্গ করেন!

ভয় পান চট্টরাজ। হয়তো কোনদিন তিলাইয়াব মানুষগুলো তাঁর টুঁটি চেপে ধরবে! তাই সহর থেকে মুখ ফেরান। অরণ্যে ডুব দেন। স্থলভ আদিবাসিদের মধ্যে নিবৃত্তি খোঁজেন। এই গাছপালা পাথুরে খাতে-বাওয়া ঝর্ণা আকাশ উন্মুখ-প্রকৃতি সহজ স্বাভাবিক মনে হয়।

মাঝখানের কয়েকটা দিন প্রয়োজন অত্যন্ত সমীহ হয়ে গেছিল। মিসেস গোয়েলের সঙ্গে পরিচিত হবার পর বাঁধা বরাদ্দের নিয়মিত সরবরাহ তাঁর উত্তেজনায় শৈথিল্য এনে দিয়েছিল।

জাদু জানা ছিল মেয়েটার। কতোদিন একলাই জীপে করে পাড়ি দিয়ে এসেছে ন্যাশনাল ফরেস্টের দীর্ঘ অন্ধকার অরণ্য। চট্টরাজের জীপও কতোদিন হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে মিঃ গোয়েলের ডেরায়। নিভৃত অন্ধকারের রমণীয়তায় সাজানো

সংসারের পরিবেশ। যে সুখ তার আয়ত্বের বাইরে রয়ে গেল এখানে তার কিছুটা স্বাদ পেতেন। অবশ্য কতোটুকু তার পরিধি। স্বগতোক্তি উচ্চারণের মতো ক্ষণস্থায়ী।

মিসেস গোয়েলের দেহ লাবণ্যে আশ্চর্য অবলীন। বন্ধ্যাত্বের স্থিতি যৌবনের পরিসরকে আরো দীর্ঘ করেছে।

মিসেস গোয়েলের সঙ্গে চট্টরাজের ঘনিষ্ঠতা বাতাসে ভাসতো। কেউ হয়তো লাগিয়ে থাকতে পারে মিস্টার গোয়েলকে—একদিন খুন করবেন বলে শাসিয়েছিলেন দেবিকা গোয়েলকে। দেবিকাই বলেছিল। কিন্তু এ পথ সে বেছে নেবে ভাবতেও পারেননি চট্টরাজ।

একদিন খবর পেলেন মিসেস গোয়েল আত্মহত্যা করেছেন। বিশ্বাস করেননি চট্টরাজ। বিহ্বল হয়েছেন। অসম্ভব। এত যার বাঁচার সাধ সে কখনো রামগড় পাহাড়ের উপর থেকে হাজারিবাগের জঙ্গলে বনস্পতিদের আলিঙ্গনে ঝাঁপ দিতে পারে না। চট্টরাজ জানেন সবটাই টিম্বার মার্চেন্ট মিস্টার গোয়েলের বানানো—আসলে নিজেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।

চট্টরাজের কিছু করবার উপায় ছিল না। তাই সরে থাকতে হল। তার বুকেব কাছে তখনো মিসেস গোয়েলের বিশ্বস্ত নিঃশ্বাসের আনাগোনা।

তিন দিন পরে দেবিকা গোয়েলের লাশ পাওয়া গেল। হাড় ছাড়া বুনো জানোয়ার কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। তাই ঘটা করে চন্দন কাঠ আর শুদ্ধ ঘিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন মিস্টার গোয়েল।

অবনী চট্টরাজের ইচ্ছা ছিল মিস্টার গোয়েলের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ান। ফয়সালা করেন। কিন্তু তাতে যে নাটকের সৃষ্টি হত তার জের গড়াতো অনেকদূর। তবে প্রতীক্ষায় আছেন যদি কোনদিন মুখোমুখি পান—সেই সময় বুঝে নেবেন দেবিকা গোয়েলের হিসেব। বাঁক নিলো গাড়ি। সিকদার-পাহাড়ের

গা ঘেঁষে নতুন পীচফেলা পথে নেমে গেল। গাড়ির গতি কমিয়ে সিগারেট ধরালেন মিস্টার চট্টরাজ। কখনো পথের এপাশ থেকে ওপাশে খরগোস লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে। পাতার আড়ালে একজোড়া ক্ষুধার্ত চোখ চকিতে উঁকি দিয়ে যায়।

সারা দিনের অসীম ক্লান্তি গায়ে জড়িয়ে ক্যাম্পের দরজায় এসে থামেন চট্টরাজ। আলো জ্বেলে গেট খুলে দিল রামবাহাদুর। ভেতরে ঢুকে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই কাকাতুয়া চেঁচিয়ে উঠল, সেলাম সাব—সেলাম—

বারান্দার এদিকে-ওদিকে খাঁচায় টানানো নানা রকমের বুনোপাখি। চারদিকে চোখ ফেলে ঘরে ঢুকে গেলেন চট্টরাজ।

কোন দরকার নেই। তাই বেয়ারাকে সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আলো নিভিয়ে মশারী নামিয়ে দিলেন!

গাছপালায় মৃদু মর্মর। জানালার ওপাশে নক্ষত্রের অলৌকিক রাত!

দূরে কোথায় সম্বরের গম্ভীর ডাক। ক্ষুধার্ত চিতার ঘর্ঘর। পাশ ফিরলেন চট্টরাজ।

সারাটা সকাল সাইটের কাছে ছায়ায় গা ডুবিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে প্লান সম্পর্কে আলোচনা করলেন মিঃ চট্টরাজ। ছু' একটা আইটেম নতুন করে যোগ করতে হল। জল সরবরাহের ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ ছুশ্চিন্তা ছিল। তোপচাঁচি থেকে জল আনতে গেলে যে খরচা পড়ত তাতে সমস্ত পরিকল্পনার ন্যাজামুড়ো ছেঁটে দিতে হত। অথচ কাছাকাছি সুঝারিয়া নদীতে বাঁধ দিতে পারলে পানীয় জলের খরচা সিকিতে নেমে যাবে।

জায়গাটা স্কীমের মধ্যে ছিল না। নতুন করে এ্যাড্জাস্ট্ করে

দিলেন চট্টরাজ। হেড-অফিস থেকে অনুমোদন এলেই কাজ সুরু।

এগারোটা নাগাদ ক্যাম্পের দিকে ফিরলেন। মন খুসিতে ভরা। পায়ে হেঁটে ফিরছিলেন। পাহাড়ের তলায় তাঁর ক্যাম্প। মিষ্টি সময়। চারদিকে মুগ্ধ ছবি। নির্জন শালবন। ছোট নদী। পাখিদের কাকলি। একটি-দুটি, কখনো কয়েকটি। ঘন বনে ঘেরা সিকদার পাহাড়ের জঙ্গলে মোষগুলো চরে বেড়াচ্ছে। তাদের গলায় একটানা ঘণ্টার শব্দ বেজে চলেছে।

একটা ছেলে মানুষি খুশিতে শিস্ দিয়ে পাহাড়ে উঁচু-নিচু পথ বেয়ে নেমে চললেন চট্টরাজ।

ক্যাম্পে ফিরে একটু কোল্ড কফি খেলেন ইজিচেয়ারে এলিয়ে। তারপর পাখির তদারক করতে বসলেন। সব পাখির নাম জানা নেই শুধু রঙ দেখে আর শিস্ শুনে কেনা। সাঁওতাল আদিবাসিরা মোটা দামে বেচে দিয়ে গেছে।

একটা খাঁচার কাছে থেমে গেলেন চট্টরাজ। ডানা ঝাপটাচ্ছে এক জোড়া নীল পাখি, নীলচে পাখি। ওদের বোধ হয় খাঁচা ভাল লাগছে না। নীল আকাশ ডাকছে। একবার তাকালেন চট্টরাজ বাইরের দিকে—মায়াবী আনন্দ অরণ্যের আকাশে রৌদ্রে ঝলমল করছে। দরজা খুলে দিলেন খাঁচার। মুক্তির দরজাকে আরেক অভিসন্ধি মনে করে প্রথমে ডানা গুটিয়ে নিল পাখি দুটো—তারপরই উড়ে গেল আকাশে।

সকালের ক্লান্তিতে ঘাম জমেছে মুখে। তোয়ালে টেনে চট্টরাজ হাঁকলেন, রামবাহাদুর—

দুপুর নামছে।

বিকেলে ক্যাম্প থেকে একটু দূরে একটা জটলার আভাস

পাওয়া গেল। বোধহয় সাঁওতালরা আবার ক্ষেপেছে। প্রতিবেশি বনস্পতির মৃত্যু ওদের অভিপ্রেত নয়। তাই মাঝে-মাঝে হাঙ্গামা লেগে থাকে দু'তরফে। খুন-জখম হয়। কাজকর্ম কয়েকদিনের জন্য বন্ধও থাকে। স্থানান্তরের মজুরেরা ভেগে যায়। কাজ চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে।

বিরক্ত হলেন চট্টরাজ।

ইজিচেয়ার ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জনা-তিরিশেক লোকের একটা জটলা উঠে আসছে ক্যাম্পের দিকে। রামবাহাদুর এগিয়ে ক্যাম্পের গেট খুলে দিল।

কী ব্যাপার? বিরক্তিতে চট্টরাজের গলার স্বর ভারি।

বিহারি-কুলিদের সর্দার পরশুরাম এগিয়ে এল হাত জোড় করে, হজৌর, সাপুড়ে সাপটাকে বনে ছেড়ে দিতে এসেছিল। আমরা দেখতে পেয়ে ধরেছি। বলছি, আমাদের দে আমরা শেষ করে দি।

চোখ ঘোরালেন চট্টরাজ।

আধাবুড়ো সাঁওতালটা মাথা নাড়ল, হাঁ সাহেব।

কেন?

ছোট সাপ ধরেছিলাম। এখন বড়ো হয়ে গেছে! ওকে আর ধরে রাখা যাবে না।

কেন?

সাপের রাজা—রাজাসাপ—

একজন বাঙালী কুলিবাবু সঙ্গে এসেছিল। সেই বলল, শঙ্খচূড় সাপ স্যার। জঙ্গলে ছেড়ে গেলে এখানেই ডেরা বাঁধবে। বিশ পঁচিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়।

ওরা মারলে তোমার ক্ষতি কী? সাপুড়েটার উপর চোখ ফেললেন চট্টরাজ।

আমার অনিষ্ট হবে সাহেব।

ঝাঁপ খুলতে পারো ?

পারি হুজুর। গোঁপদাড়িতে ঢাকা মুখটাকে একটু অসহায় মনে হল। বড়ো তেজ হুজুর মাংস ছিঁড়ে নেবে।

বিষ কামিয়ে নিয়েছ ?

জী সরকার। তবে দাঁতে বড়ো জোর। হাত জোড় করে তাকালো লোকটা।

খোল তুমি। এক গুলিতে শেষ করে দিচ্ছি! ভেতরে ঢুকে বন্দুক নিয়ে এলেন চট্টরাজ।

লোকজন সরে দাঁড়ালো চারপাশে।

ঝাঁপির মুখ খুলতেই আলো পেয়ে ফুঁসে ওঠে শঙ্খচূড়। এখনো অনেক ছোট। তবু কোমর পর্যন্ত ফণা তোলে। তারপর ঝাঁপির ভেতর থেকে সরে এসে মাটিতে দাঁড়ায়। চোখ দুটো পান্নার মতো উজ্জ্বল লাল। ক্রুর সংকেতের বিদ্যুৎ। ফণা বার-বার আছড়ে পড়ছে মাটিতে।

বন্দুক তুলেও নামিয়ে নিলেন চট্টরাজ।

অরণ্যের রাজকীয় হিংস্রতার প্রতীক। একটা গুলিতেই শেষ করে দেওয়া যায়, কিন্তু তার থেকেও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হবে যদি সংরক্ষণ করা যায়।

আদেশ দিলেন চট্টরাজ, ওটাকে তুলে ঝাঁপি বন্ধ করো।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কুলির দল। সাহেব কি ছেড়ে দেবার আদেশ দেবেন তবে!

সাপুড়ে হাঁটু মুড়ে ধরতে গেলে—সাপটা হাঁটু রক্তাক্ত করে দিল। কয়েক জায়গার মাংস তুলে নিল। বিষ নেই তবু প্রত্যেক দংশনে বিষ ঢেলে দেবার আক্রোশ। ঝাঁপ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো সাপুড়ে। হাঁটু দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাথার কাপড় খুলে রক্ত মুছে নিল। তারপর নিজের মনে স্বগতোক্তি করল: কেউ আটকে রাখতে পারবে না—হুজুর—

ভিড় হটিয়ে দিলেন চট্টরাজ। সাঁওতালটাকে বিশ্রাম করতে বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

রামবাহাদুরকে আদেশ দিলেন, লোকটা এখানেই থাকবে।

নিজেকে ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দিয়ে মনে-মনে ভাবলেন সাপটাকে রাখবেন। কাঁচের একটা বাক্সের মধ্যে। খাবার জোগাবে সাঁওতালটা। মাস গেলে কিছু দিলেই হবে।

চোখের সামনে অনতিদীর্ঘ প্রত্যক্ষ মৃত্যু প্রত্যেক মুহূর্ত অরণ্যের ভয়াল ত্রাসে পূর্ণ করে রাখবে। ওর চোখ দুটো সবচেয়ে ভালো লেগেছে চট্টরাজের—মৃত্যুর মূঢ় বিজ্ঞাপন। চোখের সামনে অথচ নিরাপদ দূরত্বে থেকে জীবনের শ্লথবিলাস উত্তেজনায় পূর্ণ করে রাখবে।

হেসে উঠলেন চট্টরাজ।

ভয় পেয়ে কাকাতুয়া চেঁচিয়ে উঠল, সেলাম সাব—সেলাম—

কয়েকদিনের মধ্যে লোহার ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের বাক্স তৈরি হয়ে এল, তার মধ্যে ঠাঁই পেল সাপ। চট্টরাজের ক্যাম্পের ড্রইংরুমের মাঝখানে স্টাণ্ডের ওপর ওপর কাঁচের ঘরটা দাঁড়িয়ে রইল। তার সামনেই চট্টরাজের ইজিচেয়ার।

সাঁওতালটাও রয়ে গেল। সেই পাহাড় খুঁটে সাপ এনে দিত। কাঁচের বাক্সের মধ্যে সাপটা প্রথমে নিজের অসহ: বন্দীত্বকে অস্বীকার করে মাথা খুঁড়ে মরতো। রক্তাক্ত হয়ে যেত তার মুখ। তারপর একেবারে চুপ করে গেল। নিজেকে কুণ্ডলীর মধ্যে অলস করে স্থির হয়ে রইল।

সাপটা আসবার পর চট্টরাজ নিজে খাঁচার দরজা খুলে পাখিগুলো উড়িয়ে দিলেন। কন্ট্রাস্ট ভালো লাগে না চট্টরাজের। সহজ খুশির সঙ্গে নির্বিকার মৃত্যুর নিথর বিকার ভালো লাগল না। শুধু বাইরে কাকাতুয়াটা রয়ে গেল। সেই সময়-অসময় চেঁচাত, সেলাম সাব—সেলাম—

মাঝে মাঝে সাপটার নিঃশব্দ অবস্থিতি ক্ষেপিয়ে দিত চট্টরাজকে। ফেন্সিং-এর সরু লোহার তার দিয়ে খোঁচা মারতেন। আর তখনই জেগে উঠত সেই আরণ্যক হিংস্রতা। মুহূর্তে তার কুণ্ডলী বিশৃংখল হয়ে যেত। শান্ত অবয়বে জোয়ারের ছায়া পড়ত। ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তো তার শরীর। আর নিজের দেহকে নিজেই ছুবলে রক্তাক্ত করে দিত। তখন তার চোখে কঠিন ও দ্রুতমৃত্যুর জ্বালা প্রতিহিংসার আগুনে পিঙ্গল হয়ে, বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতা নিয়ে কাঁচের ওপর ব্যর্থ আঘাত হয়ে রক্ত লিখে দিত।

কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে নিঃশব্দ হাসি নিয়ে বসে থাকেন চট্টরাজ। টেবিলে কড়া ককটেলের পেগ। শেরি জিন আর রমের মনোরম সমাবেশ। তার উপর বেনসন্ এণ্ড হেজেস্ সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ার অবকাশ।

হাসেন চট্টরাজ, কিরে শয়তান কিছু করতে পারলি ?

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ।

চট্টরাজ নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙেন, পারলি নে!

অতবড় ফণার দুপাশে রক্তবিন্দুর জ্বালা চমকে-চমকে কাঁপে। আগুনের মতো লাল চেরা জিভ ডাইনির হাসির মতো লকলক করে!

নিঃসঙ্গ জীবন পূর্ণ হয়ে যায়। কাজেও অনেক সময় ভাঁটা আসে। সম্মানিত অতিথিদের কেউ এলে তাদের দেখান। গর্ব করেন, হাজারিবাগের জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়াল আরণ্যক হিংস্রতাকে কাঁচের ঘরে বন্দি করে রেখেছি।

সেদিন ধানবাদের তরুণ কোল কমিশনার মিস্টার মিশ্র তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন তারা।

হরিব্‌ল্। মিসেস মিশ্র অস্ফুট উচ্চারণ করলেন।

কে, আমি না ও! কৌতুকের হাসি অবনী চট্টরাজের মুখে।

তু'জনেই। উত্তর শোনা গেল। বোধ হয় পাপিয়া মিশ্রের ঠোঁট ঈষৎ ওঠানামা করে।

দ্যাট্‌স্ রাইট্। হাসলেন চট্টরাজ, আমরা তুজনেই ভয়ঙ্কর। চেয়ার পেতে ওর সামনে বসে থাকি। কে কাকে ভয় করে বলতে পারিনে! ওর বিষ আছে আমার আছে লোডেড্ গান।

সেই সময় অকস্মাৎ ফণা তুলল সাপটা।

লুক্! দ্য মন্‌স্টারাস্ বিউটি। চট্টরাজ ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রিয়েলি। আগন্তুকদের কেউ সাড়া দিল ফিসফিস করে।

আসুন ঘরে বসা যাক। ফিরলেন চট্টরাজ, বেচারা জানে ওর হিংস্র আক্রোশকে আমি বন্দী করে শো-কেসে রেখেছি।

তু'জনকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

এই ঘরে আপনি থাকেন? মিসেস মিশ্রের চোখে আতঙ্ক।

হ্যাঁ—না ঠিক এই ঘরে নয় পাশের—

অল্ দি সেম্। কাঁপা গলায় উত্তর দিলেন মিসেস মিশ্র। মৃত্যুর সঙ্গে এক সঙ্গে—

—বাস নয় মিসেস মিশ্র। একটি কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে মৃত্যু, এপাশে জীবন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে না! ভুলতে পারি না আলোটার ওপাশে অন্ধকার। জীবনের ওপাশে মৃত্যু, মাঝখানে একটা কাঁচের দেওয়াল। সেটা কাঁচের মতোই ঠুনকো। সিগারেটের ছাই ঝাড়েন মিঃ চট্টরাজ। চোখে অনাবিল কৌতুকের আভাস।

তুমি পারবে না পাপিয়া। মিস্টার চট্টরাজ কথা বলার আর্টেও দক্ষ। মিষ্টার মিশ্র ওদের তুজনের দিকে তাকিয়ে হাসেন।

হয়তো তাই। কাঁধ ঝাঁকালেন মিঃ চট্টরাজ, চলুন বাইরে বসা যাক বরং। ড্রইংরুমের পর্দা টেনে দিলেন তিনি।

বারান্দায় সিলোইজিনি অর্কিডে ফুল ধরেছে। মিষ্টি গন্ধ আসছে।

মিসেস মিশ্র চারদিকে তাকিয়ে বললেন, আঃ লাভলি!

চা এলো। এলোমেলো কথার সংলাপে আলাপ রমণীয় হয়ে উঠল। যাবার আগে মিসেস মিশ্র বললেন, আবার আসবো। আর একবার দেখবো ওকে—

এনি ডে। দুজনকে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন চট্টরাজ।

শিস্ দিয়ে ফিরলেন গেটের কাছে থেকে। সিঁড়ির কাছে এসে পায়ের ভাঙা সন্ধিতে ঈষৎ ব্যথা অনুভব করেন। বারান্দায় উঠে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। অরণ্যে অন্ধকার এখন পদচারি। দৃশ্যমান পৃথিবীর অবলুপ্তির মাঝে চট্টরাজের নিজেকে যেন অসহায় নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়।

দূরে সিকদার পাহাড়ের পাশে কোথায় ময়ূরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ক্যাম্পের গাছপালার ওপর বানরের কিচিমিচি। কুলিদের বসতি থেকে ওদের দিনশেষে ঘরে ফেরার হল্লা ভেসে আসছে। গাছের আগ-ডালে ছিটেফোঁটা রোদ যেন ফুলের মঞ্জরীর মতো লেগে আছে।

কখনো এই নিঃসঙ্গতাকে যন্ত্রণার মতো মনে হয়। ঘরের মধ্যে ছটফট করেন চট্টরাজ। সময়ের স্রোত যেন পাথরের নুড়িতে আটকে গেছে। আর চলতে চায় না।

বাহাদুর। চেঁচিয়ে উঠলেন চট্টরাজ, হুইস্কি ঔর সোডা লে আও—

সেলাম বাজিয়ে সরে গেল রামবাহাদুর।

মিচিগান্ বেবি, এ ফ্রেণ্ড অব মাইন্।

এ লোন ফ্রেণ্ড—। গুনগুন করে উঠলো চট্টরাজের গলায়।

বোতল আর পেঁগ সাজিয়ে দিয়ে গেল রামবাহাদুর।

বেলোয়ারি গানের কলিটা চট্টরাজের মুখে আনাগোনা করে,

ফ্রেণ্ড, এ লোন ফ্রেণ্ড, মিচিগান বেবি—রুমাল নিয়ে বোতলটাকে মুছে একটা চুমু খেলেন।

সিকদার পাহাড়ের তলায় রাত ফিরে এসেছে। জোনাকির সমাবেশ নেমেছে বনপাহাড়ের আনাচে-কানাচে। সাঁওতালদের মাদলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছেঃ দেলং—দেলং। দেলং—দেলং।

ইজিচেয়ারেই এলিয়ে রইলেন চট্টরাজ।

সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। রক্তবিন্দুর মতো চোখ দুটো স্থির।

আমেজে জড়িয়ে আসছে চট্টরাজের চোখ।

কতোক্ষণ এমনভাবে ছিলেন বলা যায় না। অনেকক্ষণই হবে বোধ হয়। এক সময় আচমকা উঠে বসে হাঁকলেন, রামবাহাদুর—

হুজুর। সেলাম বাজালো রামবাহাদুর।

সাঁওতাল সাপুড়েটা কোথায়?

পচুই খেতে গেছে। হাসলো সে।

আজ রাতে ফিরতে পারবে?

না।

জলদি। আঙুল নেড়ে ইসারা করলেন চট্টরাজ, জলদি হঠো।

বোতলটাকে নিঃশেষ করে গ্লাসে ঢেলে মুহূর্তের মধ্যেই শেষ করলেন। তারপর বিকৃত মুখের দু'প্রান্ত মুছে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন চট্টরাজ।

গাছপালার আড়ালে চাঁদের মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে দেখলেন একবার। তারপর এগিয়ে গেলেন সাঁওতালটার ঘরের দিকে। দরজা খোলাই ছিল। শুধু অন্ধকার হাতড়ে শিকারের ওপর গিয়ে পড়লেন।

শিকদার পাহাড়ের তলায় এক ভয়ানক শিকার হয়ে রইল সাপুড়ে-বৌ।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

কনস্ট্রাক্‌শনের এলাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নদীর ওপর যে বাঁধটা তৈরি হচ্ছিল তারই একটা জয়েস্ট তুলতে গিয়ে ক্রেন ছিঁড়ে গেল। বিরাট সেই জয়েস্ট হারকিউলিসের গদার মতো পাহাড়ের গায় আছড়ে পড়ল। সেখান থেকে গড়িয়ে একেবারে নদীতে। বাঁধের তলায় যে লোকগুলো কাজ করছিল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাংসের তালগোল পাকিয়ে ছিটকে গেল চারদিকে। আহত মানুষে ভরে গেল এলাকা। আর্তনাদ আর ত্রাস একসঙ্গে মিলে বীভৎস অপচয়ের অবশেষ হয়ে রইল।

অবনী চট্টরাজ নিজে সে সময় উপস্থিত ছিলেন। থানা-পুলিশে খবর দিলেন। আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে লাশের সরেজমীন তদন্ত পঞ্জীভুক্ত করে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন ক্যাম্পে ফেরা হয়নি। একলাই ফিরলেন।

ওদিকে কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়েছে! আকাশে গুরুগুরু মেঘ-পরিবহনের সংকেত। বৃষ্টির আগেই নদী পার হওয়া দরকার। একটু বৃষ্টি হলেই নদীর জল উতলে উঠবে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নদী পার হয়ে গাড়ির সামনে এলেন। সীটের তলা থেকে গর্ডন জিনের বোতলটা গলায় ঢেলে একটু যেন সুস্থ হলেন। মস্তিষ্কের কোষে একটা যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে। দুর্ঘটনার সব দায়িত্ব তারই। কোম্পানীর যে লোকসান তার অনেকখানি ডিরেক্টররা তাকে নাস্তানাবুদ করে মিটিয়ে নেবে। হয়তো কলকাতায় ডেকে পাঠাবে। বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স-এর ইণ্ডিয়ান ম্যানেজমেণ্টের এজেণ্টের মুখোমুখি জেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে চট্টরাজের। কাল সকালেই দুর্ঘটনার রিপোর্ট শেষ করে পাঠিয়ে দিতে হবে। মনে-মনে ভাবলেন।

ঝড় উঠেছে। এ সময় অরণ্যের মাঝ দিয়ে মোটর চালানো

বিপজ্জনক। তবু চট্টরাজের জীপটা ভালুকের মতো গরগর করে একটু পিছু হঠে এসে সামনের জঙ্গলের পথে নেমে গেল।

দীর্ঘ কয়েক ঋতুর পিপাসার পর মেঘের সমারোহ অরণ্যকে বিহ্বল আনন্দের উৎসব দিয়েছে।

এক চক্ষু দানবের গোয়াতুর্মি নিয়ে জীপটা ছুটে গেল। ঘোড়ার ঝুঁটির মতো স্টীয়ারিং ধরে চট্টরাজ দুর্মর বেগের বিদ্যুৎ হয়ে সিকদার পাহাড়ের তলায় নেমে এলেন।

বৃষ্টি এসে গেছে। পৃথিবী অরণ্যের অন্ধকার গুহার অতলে। বিদ্যুতের ঝলসানি সেই অন্ধকারকে যেন গথিক উচ্চতা এনে দিচ্ছে।

গাড়িটা ক্যাম্পের সামনে দাঁড় করিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন চট্টরাজ।

টুপিটা হ্যাংগারে রেখে রুমালে মুখ মুছলেন। নতুন বৃষ্টির গন্ধ আসছে। ঘরে ঢোকবার আগে সেই অন্ধকারে লেপে যাওয়া গাছপালার দিকে তাকালেন। দুর্বোধ্য চিত্রকলার উদাহরণ। চকিত ঈষৎ আলো ও গাঢ় অন্ধকারের বিচিত্রণ। জলের ছাট আসছে। কাকাতুয়াকে সরিয়ে দিলেন। অকারণে ভিজছে বেচারি। অর্কিডের গাছগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গায়েও জল লাগছে। বাইরে থাকতেই ভালো লাগছিল। আর বসা যাবে না। ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন চট্টরাজ। পিছন থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

কে ? নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন চট্টরাজ। পায়ে একটু যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। অন্যদিকে তাকালেন। সাপের বাক্সটার ওপর ত্রিপল চাপা দেয়া আছে।

একস্‌কিউজ্‌ মি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চট্টরাজ নিজের উপস্থিতি জানিয়ে।

চোখ ফেরালেন মহিলাটি, ভেবেছিলাম কথাটা আমি বলবো।

ও আপনি। 'ইভনিং মিসেস মিশ্র। এগিয়ে গেলেন চট্টরাজ, কোন অসুবিধা হয়নি তো?

না। হাসলেন মিসেস মিশ্র। হাসলে গালে টোল খায়। মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, ভেবেছিলাম, আপনি যদি না থাকেন। আপনার ঘরের সেই ভয়ঙ্কর—

এবার চট্টরাজ হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত—এনি ড্রিঙ্কস্?

চা খেয়েছি।

কুণ্ঠা ভেঙে চট্টরাজ বললেন, তা'হলে আপনার উপস্থিতি উপলক্ষে বিশেষ ড্রিঙ্কস্-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ঠিক অভ্যস্ত নয়। মিসেস মিশ্র সুগন্ধি রুমাল বের করে ঠোঁটের প্রান্তে আলতো করে ছোঁয়ালেন, অত্যন্ত ইর্রেগুলার। কখনো-সখনো।

অল্‌রাইট্। সিগারেট ধরালেন চট্টরাজ, মাইল্ড্ প্রিপারেশন্ করা যাক।

মাইল্ড্ মানে?

আমি কক্‌টেলের কথা বলছি। এফেক্ট্ শিথিল করে দেওয়া যায়। সুস্বাদু স্বাদ আনা যায়। সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘ ওড়ালেন চট্টরাজ। মুখে একটু হাসি দেখা দিয়ে সরে গেল। এটা আমার নিরিবিলিতে তাস খেলার মতো। এ্যাসট্রেতে সিগারেট রেখে বললেন, বরং বলা যায় আর্টিস্ট যেমন রঙের ওপর রঙ চাপিয়ে তার এফেক্ট আদায় করে আমিও তেমনি জিনের সঙ্গে জিঞ্জার মিলিয়ে টেস্ট্ আদায় করি। দুটো আঙুল দিয়ে এ্যাসট্রে থেকে সিগারেট তুলে নিলেন, কোথায় গেছিলেন?

রাজগীরে এক বান্ধবীর বাড়ি। সেখান থেকেই ফিরছিলাম। পথে ঝড়-বৃষ্টি। কোথায় যাই। আপনার এখানেই উঠতে হল। বোধহয় অসুবিধা হল আপনার—

উচ্চকিত হাসলেন চট্টরাজ, এ রকম অসুবিধের সৌভাগ্য জীবনে কখনো হয়নি।

একটু লজ্জিত হলেন মিসেস মিশ্র। তার রঙ করা সুমিত আঙুলগুলো হাঁটুর ওপর অলস হয়ে পড়ে রইল।

আজ আপনার ফিরে যাওয়া হবে না বোধহয়।

তাই তো দেখছি। জানলা খুলে একবার দেখলেন মিসেস মিশ্র। জলের ছাট এসে লাগে সারা মুখে।

ধানবাদ এখান থেকে অনেকটা।

তাই হবে।

অসুবিধা হবে হয়তো। ব্যাচিলর্স ডেন। চট্টরাজের কুণ্ঠিত গলার স্বর।

বৃষ্টি থামলেই চলে যাবো।

বৃষ্টি যদি না থামে। সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন চট্টরাজ। মুখে থমথমে হাসি।

তার মানে! অসহায় মনে হল মিসেস মিশ্রকে। একি আপনি উঠছেন ?

হ্যাঁ। এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করবেন মিসেস মিশ্র। পানীয়টা আপনার সামনে তৈরী করতে চাই। এ সৌভাগ্যকে অবহেলা করতে পারবো না। ইটস্ এ ডে অব ডে—। ঘরের বাইরে গেলেন চট্টরাজ। এ নাইট অব্—'

ঘরের মধ্যে একলা বসে রইলেন মিসেস মিশ্র। বাইরে ঝড়ের বাতাস গোয়ার্তুমি করে চলেছে।

আপনাকে এ কথা মানতেই হবে। আবার ফিরলেন চট্টরাজ, সভ্যতার মূলকথা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য—

বোধ হয় তাই হবে। সমর্থন করলেন মিসেস মিশ্র।

চট্টরাজের আরও কিছু বলবার ছিল। তার আগেই রামবাহাদুর টেবিলে বোতল সাজিয়ে দিয়ে গেল। সঙ্গে অনুসঙ্গ পানীয়।

টেবিলের ওপর থেকে জিনের বোতল তুলে ওয়াইন কাস্কে ঢেলে দিলেন চট্টরাজ। জিনের বেসের ওপর জিঞ্জারের ঝাঁঝ চাপালেন। তারপর দুটোকেই চাপা দিলেন লাইমজুসের সৌগন্ধ্য মিলিয়ে। ভালো করে শেক্ করে নিলেন। চট্টরাজের মুখের হাসি বিজ্ঞাপনের আলোর মতো জ্বলছে-নিভছে। এক-একবার তাকিয়ে দেখেন মিসেস মিশ্রের মুখের দিকে।

একসময় পাত্র এগিয়ে দিলেন চট্টরাজ, অনুগ্রহ করুন। তারপর নিজের পাত্র হাতে তুলে বললেন, এখানে আপনার উপস্থিতি উপলক্ষ্যে—মিসেস মিশ্রের পাত্রের গায় নিজের পাত্র ছুঁইয়ে নিলেন।

হাসলেন মিসেস মিশ্র।

কথা বললেন না চট্টরাজ। শুধু মিসেস মিশ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মুখ থেকে পাত্র নামিয়ে মিসেস মিশ্র বললেন, লাভ্‌লি ভেরি ডেলিসাস্।

উত্তর না দিয়ে সিপ করলেন মিঃ চট্টরাজ।

বাইরে বাতাসের হানাহানি কমে গিয়ে আবার বেড়ে উঠছে। বিদ্যুতের আলো চকমকি পাথরের স্ফুলিংগের মতো ঝরে পড়ছে। বন্ধ জানালা-দরজায় বাতাসের করাঘাত একটানা বেজে চলেছে।

বৃষ্টির দিনগুলো আমার বেশ লাগে।

নিজের বাড়িতে। সংলাপ যোগ করে দিলেন মিসেস মিশ্র। আমার কথা ভাবুন। মিস্টার মিশ্র হয়তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমি নিজেও খুব স্বস্তিতে নেই।

খুব এ্যাঙশাস ?

একটু তো বটেই।

বাইরে কোথায় ভয়ার্ত হরিণের আর্তনাদ শোনা গেল। মনে হল আর্তনাদটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, লেপার্ড শিকার ধরেছে।

আপনি যদি অনুমতি দেন, একটু হাত কচলালেন অবনী চট্টরাজ, নতুন একটা ড্রিংক প্রিপেয়ার করি। এফেক্ট্ মাইল্ড, কালার গোল্ডেন রেড্।

মিসেস মিশ্রের পারমিশনের অপেক্ষা করলেন না চট্টরাজ। পোর্ট ওয়াইন জিন আর ব্রাণ্ডির বোতলটা হাতের কাছে টেনে নিলেন। ওরি মধ্যে আবার মিসেস মিশ্রের দিকে তাকিয়ে পরিমাণের সমীকরণটা সিদ্ধান্তে আনলেন। আড়াই আউন্স পোর্ট ওয়াইনের সঙ্গে দু'আউন্স জিন মিশিয়ে এক চতুর্থাংশ ব্রাণ্ডির সংমিশ্রন দিলেন। তারপর অরেঞ্জের রঙ ও গন্ধের লাবনী মিশিয়ে স্বাদের উপাখ্যান সৃষ্টি করলেন। অনেকক্ষণ সেক্ করে খোলা বাতাসে রেখে বললেন, আর একটু লাইট করে দি ?

ভালো হয়। উত্তর দিলেন বটে তবু যেন আনমনা মিসেস মিশ্র, বৃষ্টি কমবার কোন লক্ষণ নেই !

নাই বা কমলো—আপনি তো পথে পড়ে নেই !

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল।

নাইস্।

কী ? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মিশ্র।

চিলি-চিকেন্। হাসলেন চট্টরাজ, পানীয়ের অনুষ'। লেট'স্ হ্যাভ—নিজের প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সেই নির্জন ঝড়ের রাত মিসেস মিশ্রের দিকে চেয়ে চট্টরাজের 'টিকটিকি ও পতঙ্গে'র উপাখ্যান মনে পড়ল। ককটেল্ সিপ করলেন।

মিসেস মিশ্রের অবয়ব ঘিরে ভাবনার প্রবাহ জটিল হয়ে উঠেছে। বারংবার বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

দ্যাট্'স দি আইডিয়া ! উঠে পড়লে চট্টরাজ। কয়েক পা এগিয়ে স্নেক্-চেম্বারের ঢাকনা খুলে দিলেন।

চট্টরাজকে অনুসরণ করছিল মিসেস মিশ্রের চোখ।

চট্টরাজের মুখের হাসি কাকাতুয়ার পাখার ঝাপটের মত নিঃশব্দে ফুটে উঠেই মরে গেল।

টেরিবল্, মিঃ চট্টরাজ টেরিবল্।

সাপটা একটুখানি মাথা তুলেছে। অস্থির হয়ে উঠেছে তার চোখ। নরকের আলোক সংকেতের মতো ক্রুর উজ্জ্বলতা।

অসহ্য। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলেন মিসেস মিশ্র, ওটাকে এখনো আপনি বিদায় করেন নি?

আই লভ্ ইট্। কঠিন কৌতুক চট্টরাজের কালো মুখের হিজিবিজিতে মিলিয়ে রইল।

মিসেস মিশ্র আর একবার উঠলেন। দরজা খুলে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন, থামবে না, কিছুতেই থামবে না বৃষ্টি। হঠাৎ তাঁর চোখটা শঙ্খচূড় সাপের ওপর গিয়ে পড়ল। কাঁচের বাক্সের মাথায় ঠেকেছে তার ফণা। ওকে খাবার জন্যে যে সাপটা দেওয়া হয়েছে সেটা মাথা ঠুকে মরছে কাঁচের দেওয়ালে।

মিসেস মিশ্র আর এক রাউণ্ড হোক।

না। মাথা নাড়লেন মিসেস মিশ্র।

আমার মনে হয়। সাপের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, ওর জন্যে আপনার নার্ভে স্ট্রেন হচ্ছে বোধ হয়। এটা আপনাকে সাহায্য করবে। প্লিজ—

উঠে দাড়ালেন চট্টরাজ। তারপরই ক্ষিপ্র হাতে জিন রম্ আর হুইস্কি মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দিলেন। ওরি মাঝখানে একবার মুখ তুলে বললেন, এটাই আমাদের শেষ রাউণ্ড—সোডা মিশিয়ে মিসেস মিশ্রের সামনে তুলে ধরলেন।

হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস মিশ্র।

নিজের পেগটাও তুলে নিলেন চট্টরাজ, লেট্'স হ্যাভ্ এ ক্যাম্বে—

লেট'স হ্যাভ্, শ্লথ হাতে গলায় ঢেলে দিলেন মিসেস মিশ্র। তারপর সোফায় বসে পড়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাম্বে কথাটা কোন দেশের শব্দ মিঃ চট্টরাজ?

বোধ হয় শ্লাভ। উত্তর দিলেন অবনী চট্টরাজ।

ওঃ। এ ছাড়া আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না মিসেস মিশ্রের। সাদা আলোটা নিভিয়ে রক্তবেগুনি রঙের একটা অস্বচ্ছ আলো জ্বেলে দিলেন চট্টরাজ। মুখে তার বিচিত্র হাসি! খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। তাবপর এগিয়ে গেলেন মিসেস মিশ্রের দিকে।

শঙ্খচূড়ও তার খাবার গিলতে সুরু করে দিয়েছে। নিরুপায় হিংস্রতাব সামনে শিকার অচেতন। অনুপায় মৃত্যুর আতঙ্কে ঘরের চেতনায় কুটিল জড়তা নেমেছে।

অনেকদিন বাদে মিস্টার চট্টরাজ যখন সেই রাতের স্মৃতি অনেকটা ভুলে গেছেন এমন সময় মিস্টার মিশ্র নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন। উপলক্ষ্য মিসেস মিশ্রের জন্মদিন। নিজে আসতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সে কথাও বললেন মিস্টার মিশ্র। বারবার যাবার অনুরোধ কবে পাঠিয়েছেন।

কথা দিলেন মিস্টার চট্টবাজ। সেই রাতের স্মৃতি তা হলে মিসেস মিশ্রকে দুর্বহ স্মৃতিব ভাবে বিধ্বস্ত করে নি। খুশি হলেন। অকারণ যে কুণ্ঠা তাকে ঘিবে ছিল নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেল। নতুন একটা আকাঙ্খার গোপন খুশিতে শিস্ দিলেন। এ্যাসিস্টান্ট্দের কাছে কাজের নির্দেশ পাঠিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন ধানবাদ। উদ্দেশ্য মার্কেটিং। তারপর সেখান থেকে চার অঙ্কের উর্ধ্ব সংখ্যায় একটা নীলার রত্নহার নিয়ে ফিরলেন। স্মৃতির অন্ধকারের মতো নীল।

দুপুরের খররৌদ্রের সমুদ্র যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। তবু এক সময় বিকেলের উপকূল এসে ঠেকল।

মুগ্ধ হতে হয়। সন্ধ্যার আকাশ নীলকণ্ঠ পাখির পর্যাপ্ত পালখ বিস্তার। নেপথ্যের অন্ধকার সমীচীন দূরত্বের পরিসরে এখনো আভাস।

নতুন চৈত্রের কাল। নীলাঞ্জন ছায়া। বন। অপরিচিত পুষ্পগন্ধ পাতার পেখম ভেঙে ডালপালার অলিগলিতে পথ হারিয়েছে।

সিকদার পাহাড়ের মাথার ওপর শুকতারা। মন আর দেরি করতে চাইছে না। জীপে উঠলেন চট্টরাজ। মনে-মনে কোন এক রাজকন্যার জন্য ময়ূরপঙ্খী ভাসালেন।

আলোছায়ায় আঁকাবাঁকা পথ। পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে!

গোলগেলি ফুলের গন্ধের মতো চৈত্র সন্ধ্যার অন্ধকার ভেঙে পড়েছে মাটিতে। গাছপালার ছায়াশব্দ নূপুরের বিহ্বলতায় চকিত।

ধানবাদে কোল কমিশনারের বাঙলোর গেটে এসে গাড়ি যখন দম নিল সন্ধ্যের অন্ধকার তখন কষ-পাথরের মতো কালো হয়ে গেছে। একটু দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। রুমালে মুখ মুছে গাড়ি থেকে নামলেন চট্টরাজ।

দরজার সামনে মিস্টার মিশ্র স্বয়ং অতিথিদের অভ্যর্থনায় তৎপর ছিলেন। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে হ্যাণ্ডসেক্ করলেন, গুড্ ইভনিং।

গুড্ ইভনিং। সাড়া দিলেন মিস্টার চট্টরাজ, আজকের উৎসবের নায়িকা কোথায়?

তিনি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

মিস্টার মিশ্র চট্টরাজকে এগিয়ে দিলেন।

ওপেন এয়ার উৎসব। আশপাশের টাউন ও প্লানিং ডিভিশনের এক্সিকিউটিভরা সকলেই সস্ত্রীক হাজির। কুমারজনেরা কেউ ফিঁয়াসে নিয়ে, কেউ নিঃসঙ্গ। স্মিত হাসি ও নমস্কার বিনিময়ে একজনের আগমন অন্যজনের সম্বর্দ্ধনায় স্বীকৃতি পেল।

ছায়াচিত্রিত কার্পিকাস ও য়ুক্লিপ্টাসের বলয়ে নিমন্ত্রিতদের দল যেন উদ্ভিন্নযৌবন রাত্রির নায়ক-নায়িকা। টেবিলে টেবিলে চীনে লণ্ঠনের আলোয় অপরিচিত প্রিয়জনের বিমুগ্ধ-মুখের মনোরম মায়া। চকিত চোখের উদ্‌ভ্রান্ত বিদ্যুত উচ্ছৃত হাসিতে রঙের ইন্দ্রধনু।

আয়োজনের ত্রুটি নেই।

তবু মিঃ চট্টরাজের মনে হল মিসেস মিশ্রকে একলা পাবার একান্ত অবসর চাই। নিজের হাতে নিভৃতে তুলে দিতে চান উপহারের আয়োজন। সুযোগ কোথায়! নিমন্ত্রিতদের সকলেরই তাকে প্রয়োজন, তারও সকলকে। তবু সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। এক সময় রাত ঘন হয়ে এল। শুরু হল যাবার পালা।

একজনকে এগিয়ে দিতে গেলেন মিসেস মিশ্র। অন্ধকার পথে যেটুকু আলো আছে তা নিরর্থক। ফেরবার পথে চট্টরাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল মিসেস মিশ্রকে। একটু জোর করেই বোধহয় হাসলেন তিনি, চললেন?

হ্যাঁ যেতেই তো হবে। চট্টরাজ একটু থামলেন, অবশ্য তার আগে আপনাকে আমার প্রয়োজন।

আমাকে!

হ্যাঁ। বাক্স থেকে হার বের করে চট্টরাজ বললেন, পরিয়ে দি?

একটু বুঝি সঙ্কোচ এসেছিল মিসেস মিশ্রের মুখে কিন্তু সহজ হাসিতে মুছে বললেন, দিন না।

নোঙর করবার মতো সাহস পেয়ে মিসেস মিশ্রের গলায় হার পরিয়ে দিলেন চট্টরাজ।

লাভ্‌লি। নিজের দিকে তাকিয়ে কলশব্দ করলেন মিসেস মিশ্র।

কৃতার্থ চট্টরাজ মিসেস মিশ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আপনার জন্মদিনে আমার সামান্য উপহার।

যা সামান্য দেবার গুণে তাই অসামান্য, মিসেস মিশ্র কম্‌প্লিমেণ্টস্‌ দিলেন।

মিসেস মিশ্রের কাছ থেকে কোন বাধা না পেয়ে আরো এগোলেন চট্টরাজ। সঞ্চয় শুধু সেই রাত্রের স্মৃতির ব্লকমনি। কাঁধে একটু চাপ দিলেন। তারপরই হাত দিয়ে লেপটে বুকের কাছে টেনে এনে চুমু খেতে গেলেন।

কিন্তু তার আগেই মিসেস মিশ্রের হাতের একটা চড় এসে তার গালে পড়ল, কাওয়ার্ড—স্কাউণ্ড্রেল—

অন্য কয়েকজন নিমন্ত্রিতরাও সেখানে এসে পড়েছিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা অতি নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল।

জীপ নিয়ে গেটের বাইরে ছিটকে এলেন চট্টরাজ। বাঁ চোখটা ভিজে আবছা হয়ে যাচ্ছে। তেঁতো লাগছে ঠোঁটের স্বাদ। মনের মধ্যে মুহ্যমান হয়ে গেলেন চট্টরাজ। ব্যাপারটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের সম্পর্কে বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাকে কোথায় পৌছে দিয়ে গেল!

বিকেলে যে পথ দিয়ে রাজপুত্রের প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন অবনী চট্টরাজ, সেই পথ দিয়ে ফিরলেন অপমানে বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যু আকাংখার উজ্জ্বল প্রার্তনায়।

কোথায় যাবেন এখন! ভয়ানক অসুস্থ মনে হল নিজেকে। ঘড়িতে দেখলেন তখনো বারোটা বাজেনি। সোজা জীপ চালিয়ে বারে গেলেন।

কয়েক পেগ জিন চাপানোর পর সুস্থ মনে হল নিজেকে। একটা দারুণ মানসিক পরিবর্তন অনুভব করলেন। সমস্ত শরীরে অপরিচ্ছন্ন ক্লান্তি। কাটা ঠোঁটে জ্বালা করছে। রুমাল দিয়ে আর একবার মুছলেন। নিজের সম্পর্কে সমস্ত ভাবনা অভূত-বিরতি পেল।

চারদিকের পরিলেখা অন্ধকারে অপ্রাকৃত উত্তর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন চট্টরাজ। জীবনের অনেক নৈরাশ্যে মৃত্যু কামনা করেছেন। সে কি এই মৃত্যু।

বারের খোলা জানালা দিয়ে গেট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হাওয়ায় কাঁপছে মাধবীলতা। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঠোঁটের কাছে টেনে নিলেন পাত্র।

বোয়, বিল দিয়ে উঠে পড়লেন চট্টরাজ। টলতে-টলতে জিপে গিয়ে উঠলেন। গায়ে অস্বস্তির মতো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডে এসে পড়লেন। অন্যদিন হলে চট্টরাজ দু'পাশের পাখির ডানার মতো মাঠের দিকে এক-আধবার তাকিয়ে দেখতেন। গুনগুন করে আশ্চর্য একটি গানের কলিও উচ্চারণ করতেন। আজ কোন দিকে মন নেই। শুধু অন্ধ আবেগে তার যন্ত্রসঙ্গীকে নির্মম বেগে ছোটালেন।

সিকদার-পাহাড় আর কতো দূর!

ফ্রন্ট ভিউর কাঁচে ঝনঝন করে বাতাস বাজছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা ভয়ে থরো-থর।

সিকদার পাহাড়ের নিচে সেই অন্ধকার ঘরের অকুণ্ঠিত আশ্রয়ের অভ্যর্থনা পরম কাম্য বলে মনে হল।

হঠাৎ গাড়ি শ্লথ হয়ে থেমে গেল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও স্টার্ট নিল না। অগত্যা নামতে হল গাড়ি থেকে।

তেল ফুরিয়ে গেছে। হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

হেল্। সিগারেট ধরালেন চট্টরাজ। সন্ অব্ এ গান্—গাড়ির উদ্দেশ্যে কটূক্তি জুড়ে দিলেন। তারপর জঙ্গলের পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

চারদিকের নির্জনতা কফিনের বাক্সের মতো নিথর। চাঁদের আলো গাছপালার মাঝ দিয়ে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে

হল তিনি যেন কোন অপরিচিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করছেন। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছেন না। পা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

এখন একটুও বাতাস নেই। জোনাকির ওঠা-নামা আরো নিস্তব্ধ। আরো নির্মম।

পাখির ডাক শুনতে চাইলেন, তাও নেই। সমস্ত প্রকৃতিতে অজ্ঞাত রহস্য ও জটিল স্তব্ধতা।

সাঁও॰লটার বৌয়ের কথা মনে পড়ল। ক্ষুব্ধ একটা ক্ষুধার বাসনা মনে হল নিজেকে।

গেটেব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চট্টরাজ। আবছা অন্ধকাব আর গাছপালায় ঘেরা কোয়ার্টারের ছায়াচিত্র এক মুহূর্ত চেয়ে দেখলেন। তারপরই এগিয়ে গেলেন সাঁওতালটার ঘরেব দিকে—মেয়েটাব বুকের কাছ থেকে লোকটাকে ছুড়ে ফেলে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে যাবেন।

এক লাথিতে দরজা খুলে ফেললেন চট্টরাজ।

আঃ। খোলাই ছিল বোধহয়। ঢুকে গেলেন ভেতরে। অন্ধকার। কেউ নেই। খাঁ খাঁ করছে ঘরটা। মাথাটা বারবার ঝুলে পড়ছে! টেনে সোজা করলেন চট্টরাজ। তাবপর হেসে উঠলেন হা-হা কবে।

হঠাৎ পায়ের যন্ত্রণা যেন চিনচিন করে উঠল। অন্যমনস্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামলেন।

রামবাহাছুর। চেঁচিয়ে উঠলেন চট্টরাজ, বেটা বোধ হয় কুলিদের ধাওড়ায় হাড়িয়া গিলতে গেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কেউ নেই—। আর্তনাদের মত মনে হল শব্দ দুটিকে।

থাক রামবাহাছুরের দরকার নেই। ভেবেছে আজ রাতে হয়তো আমি ফিরবো না। মনে মনে ভাবলেন চট্টরাজ। আলোর চেয়ে নিরালোক, জনের চেয়ে নির্জনতাই অনেক ভালো এখন।

একটু খুঁড়িয়ে ঘরের বারান্দায় উঠলেন। কাকাতুয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ঘুমিয়েছে বোধ হয়।

দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভেতরটা বোঝা যাচ্ছে না।

এই ঘরের অন্ধকারে একদিন পাপিয়া মিশ্রকে খুব কাছে পেয়েছিলেন। সেই স্মৃতিবিষ দাহ দিল। উন্মনা যন্ত্রণার আভাস। বুকের কাছটা চেপে ধরলেন।

ঘরের মধ্যে একটু এগোতেই কিসে পা লেগে দেওয়ালের গায় পড়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্য চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটা ফোঁসানির আওয়াজে চমকে উঠলেন। একটু দূরে পরিচিত পান্নার বিন্দু শূন্যে দুলছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। পাণ্ডুর আতঙ্ক হিমেল ত্রাসে ছেয়ে ফেলল। পরক্ষণেই মনে হল স্বপ্ন। যা ভাবছেন স্বপ্ন। কোন রকমে দেওয়াল বেয়ে উঠে আলো জ্বেলে দিলেন। বেগুনি অস্বচ্ছ আলোয় দেখলেন—না স্বপ্ন নয়। বুকের কাছাকাছি ঘরের খোলা বাতাসে সেই নিষ্ঠুর হিংস্রতা। মাঝখানে অভঙ্গুর কাঁচের দেওয়াল নেই।

চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন চট্টরাজ। বোবা ঠোঁট কয়েকবার কেঁপে উঠল মাত্র। বোধ হয় একটা কুটিল অনুভব ছ'যা হয়ে বইল।

চট্টরাজের ভিতরে আরো একজন ছিল যার কা ছে মৃত্যু আজ তুচ্ছ। জীবনের সমস্ত বিস্বাদ হেমলকের মতো পান করে অসাড়। ভয় তাকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। তবু মাটিতে পড়ে গেলেন।

[পুনশ্চ। গল্পটি এইখানেই শেষ হইযা গিয়াছে ; কিন্তু অনিমেষ-ভাযা শেষ করে নাই। অবনী চট্টরাজ সম্পর্কে নিজের মনগড়া একটা ব্যাখ্যা খাড়া করিয়াছে। পড়িয়া মনে হইয়াছে ট্রাশ। কাহারো ভালো লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় বাদ দিতে গিয়াও বাদ দি ে ি লাম না। অবিকল তুলিয়া দিলাম।]

অবনী চট্টরাজকে অনেকবার দেখেছি। সেই রাজকীয় গতিবিধি স্বল্প ভাষণ ও সুমিত আচরণ ভোলবার নয়। অথচ নিদারুণ

অসঙ্গতির উদ্দেশ্যহীন বিকার তার পরিচয়কে যথোচিত লাঞ্ছনা দিয়েছে।

অনেক মানুষ দেখা যায় যাদের ন্যাজা আর মুড়ো দু-ই ছাঁটা। বর্তমানের অনতিবিস্তারকে জড়িয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা। অবনী চট্টরাজ বোধ হয় তাদেরই একজন।

বিশেষকে বিশ্লেষণ করলে বস্তুর পরিচয় মেলে; নির্বিশেষকে ধরি কি করে। সে তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে কোথাও কি কোন বেদনা ছিল জমে? কোন বিদ্রূপ অবজ্ঞার বিবর্ণ রঙ তার মনে দগদগে হয়েছিল—যার জন্যে মানুষের প্রয়োজনের সীমাকে বলয়ের বিন্দুতে নামিয়ে এনেছিলেন। তাও জানিনে।

অথচ বিচিত্র মানুষটির নিঃসঙ্গ আনাগোনা প্রতিদিনের পৃথিবীতে অপচয় হয়ে রইল। সার্থকতা যাকে বলি তেমন কিছু তো নয়। কিন্তু কেন এমন হল? এ জিজ্ঞাসার সবচেয়ে যা সমীচীন উত্তর মনে হয়েছে সেটা হয়তো আগাগোড়া অলীক। তবু বলি, অংশের অতি স্ফীতি দেহকে যেমন বিকলাঙ্গ করে মনেরও কোন দিক তেমনি ফেঁপে উঠলে সমতা হারিয়ে ফেলে।

অবনী চট্টবাজের জীবনও কি এই সিদ্ধান্তের প্রতীতী।

হয়তো। হয়তো নয়।

একটা মানুষের জীবনের শেষ কথা কি শেষ করে বলা যায়।

হয়তো যায়। হয়তো যায় না।



সোনালি অন্ধকারের সাপ

পথে এমন করে যে বৃষ্টি নেমে আসবে ভাবতেই পারিনি। এতক্ষণে বুঝলাম স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভুল করেছি। যাঁরা আমাকে নিতে এসেছিলেন তাঁরা ফিরে গেছেন। নির্ধারিত ট্রেন ফেল করে পরের ট্রেনে আসতে হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে জানলাম মাইল পাঁচেকের মতো পথ। জোরে পা-চালালে বোধহয় সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো। যেতামও। মাঠ জলা আর সাঁকো পার হয়ে গ্রাম এলাকায় পৌঁছতে সন্ধ্যে প্রায় ঘোর হয়ে গেল। বৃষ্টি এল ঝেঁপে। আর এমন দমকা বাতাস যে ছাতা সামলানো দায়। অবশ্য পৃথিবীতে কে আর ছাতা সামলাতে পারে। রাজা বাদশারাই পারেন না আমি তো মহীতোষ দত্ত (হাল সাং কলকাতা, পেশা মাষ্টারি), আমি কোন্ ছার!

জায়গাটা গাছপালায় এমনিতে অন্ধকার, মেঘে আরো ঘন হয়ে এসেছে। পথ চেনা দায়। এ অবস্থায় চেনা-অচেনা দুই সমান! বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরির পর একটা বাগানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালার ভেতর দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতে একটি গৃহসমাবেশের অসমীচীন বিশালত্ব প্রত্যক্ষ হল। বিদ্যুতের আলোয় থামগুলো যেন গূঢ় এক অনর্থের ঋজুতা। ঘোড়ার ডাকও শুনতে পেলাম। আশা হল একটু। মানুষ আছে নিশ্চয়ই। সাহস করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আপাতত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এক-রকম দৌড়ে বাড়ির বারান্দায় নিয়ে উঠলাম। আমার সামনে অপরিচিত বাড়ি অন্ধকার-জঠর নিয়ে বিনষ্ট আত্মার মতো স্থির।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। গোটা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একবার ঘোড়ার ডাক ছাড়া প্রাণের আর কোন সাড়া পাইনি।

হঠাৎ কাশির শব্দ পেলাম। ফিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন এল, কে—কে ওখানে ?

পথিক। বৃষ্টির—

নিবাস ? আমার কথা শেষ করার আগেই আবার প্রশ্ন ভেসে এল।

কোলকাতা।

উদ্দেশ্য ?

অন্ধকারে ভালো করে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না।

মানে ? একটু থতমতো খেলাম।

কি কাজে এখানে আসা ?

আজ্ঞে, হেডমাস্টারির একটা এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌ পেয়েছি নকীবপুর মাল্টি-পারপাসে !

হুঁ। প্রশ্নকর্তার কৌতূহলের নিবৃত্তি হল বোধহয়। আমাকে আর প্রশ্ন করলেন না। একটু সাহস হল।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ চটির আওয়াজ পেলাম। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে বাড়ির ভিতর গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

পিছনের দিকে একবার তাকালাম। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ যেন মনে হল পিছন থেকে আলোর ইশারা দুলে উঠল। ফিরে দাঁড়ালাম। ঝুলন্ত হ্যারিকেনটা আমার দিকে এগিয়ে এল। এবং সেই প্রথম লোকটিকে দেখলাম। দীর্ঘকায় পুরুষ। তবে ভেঙ্গে-পড়া চেহারা। ব্যক্তিত্বের ছাপ গালপাট্টা ও গোঁফের সহযোগিতায় প্রখর। গায়ে হাফ-হাতা বেনিয়ান। মাথা চুলের সবটুকু নেই। যে-টুকু আছে রসুনের মতো সাদা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ দুটো; যেমন উজ্জ্বল তেমন প্রখর। সব মিলিয়ে প্রাচীন জমিদার বাড়িতে টাঙানো তেল-চিত্তিরের ছবি যেন।

আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সরেজমিনে তদন্ত করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললাম, বৃষ্টি থামলেই চলে যাব।

বৃষ্টি। ভদ্রলোক অবাক হয়ে উচ্চারণ করলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি এই ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, চলে যাবো।

হাতের হ্যারিকেন মুখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চোখ দুটোয় বুঝি অস্বাভাবিকতা ছিল। কাঁচের উপর গনগনে আগুনের আঁচ লাগলে যেমন দেখায় তেমনি। মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করলাম।

অসুবিধে হবে বোধহয়। ভদ্রলোক বললেন। বনেদি সৌজন্যের আভাস তার গলায়।

অসুবিধে কিসের! অন্ধকারে বিনীত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে।

হবে না তো? আশ্বস্ত হলেন তিনি, তা'হলে বসতে পারেন।

যদিও ইচ্ছে ছিল না তবু তাকে অনুসরণ করতে হল। বাড়িটার গঠন সাবেক কালের—যে কালে সিমেণ্টের ব্যবহার ছিল না। চূন-সুরকি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা হত।

বারান্দা পেরিয়ে বড়ো একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। কোন আসবাব নেই। শুধু একটা টেবিল। কাঁচা সোনার মত রঙ। বোধহয় কাঁঠালের কাঠে তৈরী। খান কয়েক চেয়ার। দেয়ালে দু-একটা ছবি। হ্যারিকেনের আলোয় ছবির বিষয় একটুও বোঝা গেল না।

ভদ্রলোক বসলেন। আমার থেকে একটু দূরে। একটা ইজিচেয়ারে। এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। দু'জনের মাঝখানে বিমর্ষ হ্যারিকেনটা দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকালাম। ইজিচেয়ারের ভেতর ডুবে গেছেন।

সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিলাম। দেশলাইটা একেবারে ভিজে গেছে! .

প্রত্যেক মুহূর্তে গৃহকর্তার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন প্রত্যাশা করছিলাম।

সেই গথিক আকৃতির অন্ধকার, অনৃজু খিলানের সারি, বিশাল হর্স-সু প্যাটার্নের জানালা ও উচ্চ গৃহতলে প্রাচীন ইতিহাসের সৌগন্ধ্যের সঙ্গে দুর্বোধ্য গৃহকর্তাকে আরো দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছিল। শুধু তার যে হাত চেয়ারের হাতলের উপর এলিয়েছিল তার অনামিকায় বড়ো একটুকরো ভাল মিছরির মতো লাল-সাদা পাথর হ্যারিকেনের আলোয়ও ব্যাঙের চোখের মতো জ্বলছিল!

ভিজে বাতাসে মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলাম। অগত্যা ফুলের গন্ধকে উপলক্ষ্য করে আমাকেই নিস্তব্ধতা ভাঙতে হল।

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, কি—কি বলছেন ?

কিসের একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।

হুঁ। নিজের মনেই বিড় বিড় করলেন ভদ্রলোক, বছরের এই সময়েই ওরা আসে। থেমে গেলেন ভদ্রলোক। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, ওর নিজের হাতে লাগানো যে···এই সময়েই তো ও চলে গেছিল। —না—না, চলে যায় নি। আমি নিজে ওকে···। মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার সঙ্গে কিছু একটা চেপে ধরেছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না। আমি কিন্তু শিউরে উঠলাম। তার আগেই ভদ্রলোক শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, চলে নাকি ?

ভদ্রলোকের প্রকৃতি একেবারে অসংলগ্ন বলে মনে হল। তাঁর শেষ কথাটার অর্থও বুঝতে পারলাম না। ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসেছেন ভদ্রলোক, ইয়ে—আজকাল ছেলেদের সবারই এক-আধটু চলে শুনেছি। হাসলেন তিনি।

ইতস্তত করেও বললাম, চলে কখনো-সখনো—। মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। চাকরি করতে এসে বিদেশ-বিভুঁয়ে ফ্যাসাদে না পড়ি। নকীবপুর তো এর আশপাশের কোন গ্রাম। জানাজানি হলে আর রক্ষে থাকবে না। তবু মনে জোর আনলাম, মাষ্টারি করি বলে তো আর শুকদেবের বাচ্চা বনে যাই নি।

তবে উঠুন।

কোথায় ? একটু থেমে বলি।

উঠুন না, ভয় পাচ্ছেন নাকি ? এক নজর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার নাম ইন্দ্র সামন্ত, এখনো গড়সামন্তপুরের মালিক। এখানকার সামন্তরা পাঠানদের হয়ে মোঘলের সঙ্গে লড়েছে। নবাবের হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে।

ইন্দ্র সামন্ত হ্যারিকেন নিয়ে আগে চললেন। পেছনে আমি।

'গোপাল অতি সুবোধ বালকে'র মতো অনুসরণ করে। বাড়ির অজগর অভ্যন্তরে ঢুকলাম। বার-মহল থেকে ভেতর-মহলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার হয়ে চললাম! ঘন অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসে। একটুখানি নিষ্প্রাণ আলো আরো নিরর্থক। এর থেকে অন্ধকারও যেন স্বচ্ছ। পুরোন স্যাঁতস্যেঁতে গন্ধের সঙ্গে ভিজে চাপ-চাপ অন্ধকার দেয়ালের গায় মাখানো। চারদিকে অশরীরী অস্তিত্বের বিলাস। বাড়ির কোথায় যেন বাতাস ঝাপটা খেয়ে গুমরে উঠছে। জানলার পাল্লা আছড়ে পড়ে আবহাওয়াকে আরো চকিত করে দিচ্ছে।

বুঝলেন মশাই। ইন্দ্র সামন্ত অন্ধকারে কিছু বলতে চাইলেন!

হুঁ-উ। তার দিকে না-চেয়ে সাড়া দিলাম। কিন্তু তার আর কোন সাড়া পেলাম না।

সিঁড়ির কাছাকাছি এসে তিনি আলোটা তুলে কিছু দেখলেন। তারপর মুখে শব্দ করলেন, হেই সরে যা—সরে যা ব্যাটারা— ততক্ষণে সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সুরু করেছেন ইন্দ্র সামন্ত। ঘোরানো সিঁড়ি খানিক উঠে বাঁক নিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি?

কিছুনা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন ইন্দ্র সামন্ত, সিঁড়িগুলো ভেঙে গেছে; তাই ওরা খোঁদলে এসে ডেরা নিয়েছে।'

ওরা মানে?

সাপ-খোপ।

কি সাপ?

কেউটে—গোখরো।

ততক্ষণে অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে গেছি। পিছন ফিরে নামবারও উপায় নেই। সামনে-পিছনে দু'দিকে সমান অন্ধকার। মাথার ওপরে ছাদ ঝুলে পড়েছে। পথটাও এত সরু পাশ ফিরতে

গেলে কাঁধে আটকে যায়। তবু পিছনে তাকালাম একবার। তাকিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলাম। এ জীবনে বোধহয় ছাত্রউদ্ধারের মহৎ-দায়িত্বের ব্রত আর শেষ হল না। কোলকাতার বাঁধাধরা সুখী জীবন থেকে নিজের লুব্ধতার পাকে জড়িয়ে নিজেকে কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এই হেডমাষ্টারি থেকে কলকাতায় এ্যাসিটেণ্ট টিচারের চাকরিকে মনে হল যেন স্বর্গ। এখন আর কোন উপায় নেই!

অনেকগুলো সিঁড়ি আর সিঁড়ির বাঁক পার হয়ে থামলেন ইন্দ্র সামন্ত। খোলা-মেলা একটা জায়গা। বোধহয় বারান্দা জাতীয় কিছু হবে। মনে হল তিনতলা।

আলোটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, বসুন।

একটা কালো পালিশ তোলা বুড়ো টেবিল। তাকিয়ে দেখলাম টেবিলের ওপর পুরু হয়ে ধুলো জমে নেই। পরিষ্কার। ঝকঝকেই বলা যায়।

বসুন। আর একবার বললেন ভদ্রলোক।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি দেখা যায়। অন্ধকারে একএকবার বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। গাছপালার নিষেধ ছাপিয়ে বাতাস এসে ঝাপিয়ে পড়ছিল। কাছেই কোথাও জলের স্রোত দুর্বার অবাধ্যতায় স্ফীত।

একটু বসুন আপনি। আসছি। আলোটা নিয়ে যাবো?

তাহ'লে আমাকেও উঠতে হবে। আমার বিবর্ণ হাসির নিচে ভয় উঁকি দিল।

ভয় করছে নাকি?

তাকিয়ে রইলাম। উত্তর দিলাম না।

তারপর বললাম, নকীবপুর স্কুলের সেক্রেটারিকে যদি একটা খবর পাঠাতে পারেন—

তবে আলো নিয়ে বসুন। আমি খবর পাঠিয়ে আসি। ইন্দ্র সামন্ত চলে গেলেন।

একলা বসে আছি। মাঝে-মাঝে এক-আধটা চামচিকে ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন প্যাঁচার ডাক শোনা গেল—হুম্—হুম্—হুম্।

আলোটা টেনে নিলাম। হাতের কাছে থাক। চারদিকে তাকিয়েও বোঝা গেল জায়গাটা ব্যবহার হয়।

দেশলাই আগুনে সেঁকে সিগারেট ধরাতে পারলাম। বৃষ্টিতে খাঁটি বিলিতি জিনিষের নাম শুনে একটা গোলাপি স্বপ্ন তৈরি হচ্ছিল। বোধহয় একটু তন্দ্রাও এসে গেছিল।

ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

চমকে উঠলাম, না না।

জল দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ইন্দ্র সামন্ত হাসলেন। অনেকদিন এ সবের রেওয়াজ নেই কিনা! গুছিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। বসে হাই ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। খাবার-দাবারও জোগাড় করা গেল না। ঘোড়ার দানা দিয়েই কাজ সারতে হবে, হেসে উঠলেন তিনি। ঢালতে ঢালতে বললেন, অনেক দিনকার স্টক্। সাহেবদের জন্যে এনে রাখা। আর একজনও—থেমে গেলেন তিনি, সুরু করুন মশাই—

হ্যারিকেনের আলোয় সোনালি সোমরস টলমল করে উঠল। গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে নিলাম। এ সব ক্ষেত্রে উভয়ের স্বাস্থ্য পান বিধেয়। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। আমি কিছু বলেছিলাম কিনা মনে নেই।

নিঃশব্দে পান করছিলাম। এ সময় প্রলাপ নিদেন পক্ষে একটু আলাপ হলেও ভালো হয়। নীরবতা অসহনীয়।

ইন্দ্র সামন্ত দু'চার টানে অনেকখানি মেরে দিয়ে বললেন, আমি ঢালছি আর একটু—

পেগ দুই ঢেলে নিলেন তিনি।

কেউ বিশ্বাস করে না আমায়! হঠাৎ মৌন ভেঙে সোজা হয়ে বসলেন ইন্দ্র সামন্ত।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

নায়েব-গোমস্তা অতদিনের পুরোন চাকর শম্ভু বেরা কেউ বিশ্বাস করে না। আমার পাপ। না—না, বোধহয় ভুল বলছি, মন্দাকিনীর পাপ—তার পাপের—হঠাৎ থেকে গিয়ে বললেন, আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন?

মাথা নাড়লাম, কেন করবো না!

আশ্চর্য। ভদ্রলোক বিহ্বল হয়ে আমার দিকে তাকালেন, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ আপনি বিশ্বাস করুন সত্যি কথাই ওদের বলতে চেয়েছি। বলেছিও। তবু ওরা বিশ্বাস করেনি—ইন্দ্র সামন্ত নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন, ওরা বিশ্বাস করে আমি খুন করেছি। খুন ক'রে গড়খাই নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। মাথা নাড়লেন তিনি, শুধু বুঝতে পারেনি কেন মন্দাকিনীকে খুন করলাম। বিশ্বাস করুন, মাথা ঝুকে পড়ল তার, ইচ্ছে ছিল তাই। পারিনি। সেই যন্ত্রণায় বুকের কাছটা চেপে ধরলেন। তারপর যেন ঘুম ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, কি ◌ াছিলাম?

মন্দাকিনীকে—

বিশ্বাস করতে পারিনি?

তাই বোধ হয়।

আহত হলেন ভদ্রলোক, আপনিও তাই বলেন?

না না। গেলাস নামিয়ে সান্ত্বনা দিলাম, আপনি বলছিলেন তাই মনে করিয়ে দিলাম—

ও হ্যাঁ। ভদ্রলোক নিজেই শান্ত হ. গেলেন, আমার বাবা ধূর্জটি সামন্ত ঘোড়ায় চড়ে মহাল থেকে ফিরছিলেন। রূপনারায়ণ থেকে জল নিয়ে আসছিল একটি মেয়ে। দেখে ভালো লাগল তাঁর।

বোধহয় নিজের ছেলের জন্যে এমনি একটা টুকটুকে বউ খুঁজছিলেন। ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন তার সামনে, এই খুকি শোনো।

মেয়েটি মুখ ভেঙচে গাছপালার আড়ালে সরে গেল। বাবা পিছনে চললেন। জায়গাটা আমাদের জমিদারীর মধ্যেই, ঘোড়া নিয়ে বাবা মেয়েটির বাড়ির উঠোনে হাজির।

তারপর বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথা পাকা করে উঠলেন।

আমার তখন একুশ বছর বয়েস। সবে বি. এ. পাশ করে বাড়ি এসেছি। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবিদের সঙ্গে খুব মাখামাখি। কারো সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের মিমোসা ফুলের বনে ঘুরছি। কারো সংগে লেকের জলে নিজের ছায়া দেখছি। কেউ মাটি থেকে আলোয় তুলে পাখিদের সঙ্গী করে দিচ্ছে। মোট কথা বস্তু থেকে ছায়ার দিকেই তখন লক্ষ্য। কি ভেবে নিজের মাথা নাড়লেন ইন্দ্র সামন্ত। পুরোনদিনের স্মৃতিচারণ থেকে ভেসে উঠে বললেন, সেই সময়টা আপনাকে বোঝাই কি করে। অমন চেহারা আমি দেখিনি। নিজের স্ত্রী বলে বলছি না। এত সুন্দর যে হাত দিতে ভয় করে। ঘন চোখের পাতার নিচে লজ্জা ছলছল করছে। ছেলেমানুষি একটা হাসি ঠোঁটের উপর যেন ছেলেখেলা করছে। হঠাৎ যেন পুঁথির কাব্য থেকে জীবনের কাব্যে নেমে এলাম।

যে আনন্দ যৌবনে সপ্তর্ষি তারাদের আত্মীয় সেই আনন্দ উৎসবের আয়োজনে বিলম্বিত তাল ফেলে নূপুরের দ্রুত লয় হয়ে উঠল। অনাঘ্রাত ঠোঁটের কাছে ঠোঁটের অঞ্জলি পেতে পিপাসার রক্তপীত ফুলের বনে অধীর হয়ে উঠলাম। দম নিলেন ইন্দ্র সামন্ত, একটু বেশি কাব্য হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়?

তা' হোক। রস ঘন হলেই কাব্য হয়। আমি আশ্বাস দিলাম তাকে।

কয়েকটা বছর ভালো চলেছিল। মাথার ওপরে থেকে বাবাই জমিদারী দেখতেন। আমি অন্দরে মন্দাকিনী অগাধ যৌবনের

আড়ালে ডুবে থাকতাম। অনেক রাতে হাওয়া এসে দু'জনের চোখ থেকে ঘুমের লজ্জা সরিয়ে নিত। সমস্ত রাত্রি অসংবদ্ধ কথার প্রলাপে উর্মিল হয়ে উঠত।

অনেক দিন মন্দাকিনী ঘুমিয়ে পড়ত। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চোখ ফেরাতে পারিনে।

সৌন্দর্য যদি দেহের অতিরিক্ত কিছু হয়—যদি লাবণ্য একই সংগে ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে ছুঁয়ে হৃদয়ের সমস্ত কথা ও রূপকথাকে এক করে অন্য কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যায়—তা' হলে তাকে কি সৌন্দর্য বলতে পারি? ইন্দ্র সামন্ত আমার দিকে চেয়ে রইলেন, যদি বাধা না থাকে মন্দাকিনীকে তা'হলে সুন্দরী না বলে সৌন্দর্য বলব।

গেলাস তুলে নিযে ঝিম মেরে রইলেন ইন্দ্র সামন্ত। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি।

গেলাস নামিয়ে ইন্দ্র সামন্ত আবার সুরু করলেন, হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে বাবার মৃত্যু হল। মাকে ছোটবেলাই হারিয়েছিলাম। অন্দর ছেড়ে সদরে নামতে হল আমাকে। জমিদারি মানেই কব্জিদারি। হাতের জোরেই ঠেকাতে হয়। মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লাঠিবাজি এসব তো নিত্যিকার ব্যাপার। মহালে যাওয়া সুরু হল আমার। অনেক সময় থেকে যেতেও হত। দু'তিন দিন। দিন চার-পাঁচ। কখনো দিন-সাতেক।

মন পড়ে থাকতো মন্দাকিনীর আশপাশে। ওকে একলা রেখে যেতে ভয় করতো। কেন জানিনে। হয়তো এমনি। হয়তো কারণ ছিল।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, মন্দা তোমার অসুবিধে হয় না?

কিসের? আলগোছে উত্তর দিল মন্দাকিনী।

একলা থাকতে হয় বলে?

একলা থাকি নাকি? খিলখিল করে হেসে ওঠে মন্দাকিনী। আমি না থাকলে তোমার বেশ মজা হয়—না?

মন্দাকিনী গায়ের উপর ঢলে পড়ে বলল, সে কথা আর বলতে। তুমি বাপু বড়ো জ্বালাতন করো। তুমি না-থাকলে যখন ইচ্ছে খাই। ইচ্ছে না-করলে খাই না। গুনগুন করে গান করি। যেখানে ইচ্ছে পা ছড়িয়ে বসি।

বাড়িতে পোষ্য পরিজনের অভাব ছিল না। তাদের কয়েকটা সমান বয়সী কি ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল মন্দাকিনীর। আমি বাড়ি না থাকলে আমার ঘরে বসে ওরা বিন্তি খেলত। কুড়ি-একুশ বছরের মন্দাকিনী কাঁচা হলুদের মতো টলটলে যৌবন নিয়ে তাদের মাঝখানে বসত। কেন জানি না আমার ভাল লাগতো না। একুশ বছর একটা দাহ্য বয়েস। আপনি কি বলেন?

সিগারেটে টান দিয়ে বললাম, সন্দেহ কি!

ব্যাপারটা আমি ভালো চোখে দেখিনি! শাস্ত্রেই বলে, একবার পিছলে গেলে মেয়েদের—ইন্দ্র সামন্ত ঠোঁটের কাছে গেলাস টেনে নিলেন কিন্তু ঠোঁটের গায় না ঠেকিয়ে আবাব নামিয়ে রেখে নিমীলিত হয়ে রইলেন, আমাকে একেবাবে মানতো না মন্দাকিনী।

কি করি! ছোট্ট বেলায় মা মাবা গেছেন। যে-সব মানুষের ভিড় আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে চারপাশে জমেছিল তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা—এবাব গেলাস তুলে নিয়ে এক চুমুক খেলেন ইন্দ্র সামন্ত, গাছের সঙ্গে পরগাছাব মতো আর কি!

আমার গেলাসটা খালি দেখে নিজের হাতে ঢেলে দিতে গিয়ে বললেন, মন্দাকিনী গরীবের মেয়ে—তবু গর্ব ছিল। সে গর্ব যৌবনের। পৃথিবীকে ক্রীতদাসে পরিণত করার গর্ব।

মন্দা। আমি কোনদিন আদর করে গলা জড়িয়ে ডাকতাম।

কি? ফিনফিনে গলায় উত্তর দিত মন্দা।

ওদের সঙ্গে তোমার মেশা আমি পছন্দ করিনে।

কি করতে হবে আমাকে?

নিজের ঘরে থাকতে হবে—তোমার সম্মান নিয়ে। ভুলে গেলে চলবে না এ বাড়ির গৃহিণী তুমি ?

সে আমি থাকতে পারবো না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো। একজন সঙ্গী এনে দাও।

তাই দেব।

বিন্দিকে নিয়ে এলাম। ওকে দেখে মন্দাকিনী হেসে বাঁচে না। বললে, ওই বুড়ির সঙ্গে কি কথা বলবো ? ও তাসের রঙ চেনে ?

উত্তর দিলাম না।

একদিন মন্দাকিনী আর বিন্দির কথা শুনলাম আড়াল থেকে।

মেজের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে মন্দাকিনী। চুল বাঁধছে বিন্দি। আয়না হাতে নিয়ে মুখ দেখছে মন্দাকিনী।

চোখ দুটো তখনো ঘুমে ফোলা। পানে ঠোঁট টুকটুকে লাল।

কি বাঁধবো দিদি ঠাকরুণ ?

জানিস নে যেন ন্যাকা ! ঠোঁট ওলটালো মন্দাকিনী, পিরিতি-বাঁধন দে।

ফোকলা দাঁতে হাসে বিন্দি, সে বাঁধবে তোমার বয়েস !

হ্যাঁরে বিন্দি। আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখে মন্দাকিনী, আমাকে কেমন দেখতে ?

লোকের মুখে শুনে তোমার পেরত্যয় হয় না বুঝি ?

না।

আয়নায় দেখেও না ?

না।

কেন ?

একটা পুরুষমানুষকে যে বাঁধতে পারে না—কেমন ছিবি তার ?

অমন কথা বলো নি। পুরুষগুলো ত তোমায় দেখার জন্যে পাগল!

কেন আমি কি পাখি না পোষা বাঁদর!

পোড়া কপাল আমার!

কতজন রে?

সে কি গুণে দেখেছি।

একজনকে এনে দিতে পারিস?

কেন?

পিঁজরের পাখি করে ধরে রাখতাম।

পুরুষের কপালে কি অত সুখ সয়! ওরা ভেড়া হয়ে থাকতেই ভালবাসে।

ভেড়া করার মন্তর তো জানি নে বিন্দি! তুই জানিস?

জানিনে আবার—সারা জীবন তো ওই করলাম!

শিখিয়ে দিস তো! আমার একটা পাখি আছে তাকে ভেড়া করে রাখবো।

ভেড়া করে রাখবে?

রাখবো না! আমাকে দুঃখ দেয় যে—

বোতলটা গ্লাসে ঢালতে গিয়ে থেমে গেলেন ইন্দ্র সামন্ত, আর একদিন মহালে যাবার আগে দুজনেই ঘরে ছিলাম। হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে শিকল তুলে দিলাম।

মন্দাকিনী চমকে বললে, ও কি? দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল সে, খোল—দরজা খোল! শেষে পাগলের মতো মরীয়া হয়ে মাথা কুটতে লাগল।

ভয় পেয়ে দরজা খুলে দিলাম।

মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করল, এসব কি?

তোমায় ঠাট্টা করছিলাম।

এমন ঠাট্টা আমায় ভালো লাগে না বাপু!

কবে যেন মহাল থেকে ফিরে গওনার বাক্সোটা বের করলাম।

মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলে, কি হবে ?

তোমাকে সাজাবো।

হঠাৎ এমন সখ কেন ?

এমনি।

এমনি সখ করার মতো লোক তুমি নও ! কৌতুক তার ঠোঁটে।

না, এমনি নয়। দেখব সাজালে তোমাকে কত সুন্দর দেখায়।

মন্দাকিনীর আঙুলে পরালাম আঙুল-চুটকি, পায়ের পাতায় দিলাম চরণ পদ্ম, তার ওপরে গুজরি আরো ওপরে পঞ্চম। মাজায় চন্দ্রহার—সোনার নীবীবন্ধনী থেকে পাথর বসানো সোনার ফুল নেমে এসেছে কোমর ঘিরে। হাতে পরালাম বাক আর বাজু; গলায় বিনোদিনী নেকলেস, সাতনরী আর কণ্ঠমালা—তিনসুতো করে মুক্তোয় গাঁথা ছ'কাঁধের ওপর ছুটো সোনার পদ্মফুল। কাব্যের পক্ষে অলঙ্কার যতো শোভন নারীর পক্ষে বোধ হয় তার চেয়েও বেশি !' সাজানো শেষ করে হাত ধরলাম মন্দাকিনীর, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসে মন্দা ?

ছোট মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠে ছু' 'ত ফাঁক করে দেখালো সে, এ-ই-ই এ-তো-খানি !

চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দাকিনী তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবো ?

ভাবি, তুমি আমায় অযথা সন্দেহ কর।

করি না। করতে ইচ্ছা করে।

ইচ্ছে হয় করো, আমার ভারি বয়ে গেছে—

তার মানে ?

বিন্দি বলে, এমন রূপ তোমার দিদিমনি পুরুষ মানুষ দাসখৎ লিখে দেবার জন্যে পাগল।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভালবাসার কেউ আছে নাকি ?

নেই আবার। অভাব কি। চোখে কেমন একটা রহস্য এনে উত্তর দিল মন্দাকিনী।

বলো কে ? হাত ধরলাম তার।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মন্দাকিনী বলল, আকাশের চাঁদ দক্ষিণের বাতাস আর বেলির গন্ধ। একটু অভিমান যেন তার গলায় অনুভব করলাম।

ইন্দ্র সামন্ত হেসে উঠলেন জোরে, মশাই পুরুষের ঈর্ষা নিরেট নির্বোধ। আপনি কি বলেন ?

আমার পাত্রে ঢেলে দিয়ে নিজেও একটু ঢেলে নিলেন।

বাইরে বাতাস আর বৃষ্টি যেন সামন্ত মশাইয়ের গল্পের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছে। বারান্দার সামনের গাছগাছালি ভেঙে নুয়ে পড়ছে। মাঠের নদীটা যেন পাগল হয়ে গেছে। স্রোতের বেগ তীর ছাপিয়ে উঠেছে। ওরি মধ্যে কখনো প্রান্তর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। কখনো বিদ্যুতের আলোয় সেই বিশাল গৃহের রহস্যগুলো নড়েচড়ে উঠেছে। মহলের খোলা জানালা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গরাদের গায় আছাড়ে পড়ছে। ভয়ে পায়রাগুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে ঃ বক্-বকুম।

ইন্দ্র সামন্ত শুরু করলেন ঃ

মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করে, তুমি এত মদ খাও কেন ?

ভালো লাগে বলে খাই।

আমাকে ভালো লাগে না ?

লাগে, ওর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললাম, সেই জন্যেই তো ভয় পাই। সেই ভয় লুকিয়ে রাখতে গিয়ে তোমাকে কষ্ট দি—নিজে কষ্ট পাই। তোমাকে আকাশের চাঁদ দক্ষিণের বাতাস কেউ পাবে না। কেউ না। কেউ না।

তুমি আমাকে সন্দেহ করো! অবহেলা করো। অথচ বাইরে গেলে নষ্ট—

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মন্দাকিনী—

আমাকে তুমি বাপের বাড়ি রেখে এসো।

কেন?

এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠছি?

তুমি রাগ করেছ মন্দা?

করে থাকলেই বা তোমার তাতে কি! তুমি পুরুষ মানুষ—থেমে গেল মন্দাকিনী। তারপর গয়নাগুলো খুলে মাটির ওপর অবহেলার সঙ্গে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল। তুমি তোমার ইচ্ছে মতো থাকো আমাকে নিজের ইচ্ছে মতো থাকতে দাও। মুখ ফিরিয়ে নিল সে। চলে যাবো কোনদিন—জানতেও পারবে না।

ভয় পেয়ে বললাম, তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না। তুমি যা চাও তাই হবে।

ওর রাগ ভাঙালাম

মন্দাকিনী বললে, কথা দাও আর মদ খাবে না। তার কাছে যাবে না।

না-না-না, তিন সত্যি করলাম।

আবার পুরোন দিন যেন ফিরে এল। অন্দর মহল থেকে আমি কয়েক দিন বেরুলাম না। মনে মনে ভাবলাম, না, আর নয়। মন্দাকিনীকে অবহেলা দিয়ে নিজে অনেক দুঃখ পেয়েছি। ইন্দ্র সামন্ত গেলাস তুলে অনেকখানি গলায় ঢেলে দিয়ে মুখটা বিকৃত করলেন। ভালোই কাটছিল দিন। কিন্তু মন্দাকিনী শুধু নিবেদন নয় বিনোদনেও নিবিড় হয়ে ‍উঠল। এই যে না-চাইতে পাওয়া এ আমার মোটেই সহ্য হয় না। অথচ সে না-চাইবার আগেই সবটুকু দিয়ে বসে আছে। প্রেমের শাস্ত্রটা একটু জটিল। বরণ

করে নিলেও আবরণ একেবারে সরাতে নেই। পুরুষের ইচ্ছেটাকে কৃত্রিম বাধার মধ্যে খেলিয়ে প্রবল করে তুলতে হয়।

বাহুবলই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমার মধ্যে পূর্বপুরুষের ওই একটা ধর্মই একটু প্রবল ছিল। যাকে সহজে পাওয়া যায় তার দাম থাকে না। আমি ক্লান্ত হয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

সুদাসপুর মহালে সেই মেয়েটির ঘরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। পিছন ফিরে দেখলাম মন্দাকিনী ছাদের ওপব দাঁড়িয়ে আছে!

প্রথম যৌবনের কথা একটু বলি আপনাকে। মহাল তদারকে বেরুনোর সময় মন্দাকিনী এই ছাদের ওপর থেকে দেখত আমাকে। মাঠের অনেকখানি দেখা যেত তখন। বাড়ির সামনের গাছপালা তখনো এত বড়ো হয়নি। ঘোড়া থামিয়ে আমিও ফিরে দাঁড়িয়েছি।

তখন হয়তো জ্যৈষ্ঠের শেষ। কৃষ্ণচূড়ায় গড়সামন্তপুরের মাঠে লালমেঘ করে আছে। মৃদু গন্ধ ভাসত বাতাসে। ফুলেব কি পাতার জানিনে। এখনো পাই। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন সামন্ত মশাই।

ফেরবার দিনও মন্দাকিনীকে অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। দূর গ্রাম থেকে মাঠের মধ্যে এসে পড়তেই মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাতাম। ঘোড়ার বেগ দিতাম বাড়িয়ে। মাঠের মাঝামাঝি এসে দেখতাম কুচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল এলিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রতীক্ষায়।

সে সব দিনের কথা এখনো মনে পড়ে। মনে হয় হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি। আমাদের সে যুগের গানের একটা কলি মনে আসছে—মধুর! সে মুখখানি কখনো কি ভোলা যায়! যায় না। রজনী সেন তার পাদপূরণ করে গান লিখলেন: জড়ায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়। আপনারা বোধ হয় এখন আর রজনী সেন পড়েন না! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সামন্তমশাই, সে যুগটাই বাতিল হয়ে গেছে আর রজনী সেন! এইখানে আবার থামলেন

ইন্দ্র সামন্ত, বুড়ো বয়েস হয়ে এই এক জ্বালা হয়েছে সব ব্যাপারে একটা তত্ত্ব খাড়া করার ঝোঁক!

এই অবসরে আমি গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলাম।

সেবার অনেক দিন পর সুদাসপুর মহালে গেলাম। ফিরতেও দেরি হল। দিন-দশেক পরে ফিরলাম। অনেকখানি পথ। ঘোড়া চালালাম জোর কদমে। মন্দাকিনীকে দেখার জন্যে আমার আর তর সইছিল না।

উপরে উঠে মন্দাকিনীর ঘরের সামনে গিয়ে চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিল সে। বোধহয় তাস খেলছিল। আমার সাড়া পেয়ে খেলুড়েরা উঠে গেছে।

ডাকলাম, মন্দাকিনী—

চমকে উঠে খাট থেকে নেমে এল সে, এসো, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন?

কি করছিলে?

তাস খেলছিলাম।

কার সঙ্গে?

বিন্দির সঙ্গে। একটু থেমে উত্তর দিল মন্দাকিনী। মনে হলো ও মিথ্যে বলল। সত্যিও হতে পারে।

তখন মাঘের কাল শুরু হয়ে গেছে। কমলালেবুর গায়ের রঙ পেয়েছে রোদ। তারি খানিকটা জলছবির মতো ওর চুলে মুখে এসে পড়েছে। এত ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

মন্দাকিনী ডাক দিল, আবার নিচে যাচ্ছো! এই এলে, একটু বসে যাও—

মেজাজ ছিল খারাপ। একে হা সনের আদায়পত্তর ভালো হচ্ছিল না তারপর মামলায় হেরে যাওয়ায় দখলদারী হাঙ্গামা নিয়ে ঝামেলা ছিল। দপ্তরে গিয়ে কাগজপত্র টেনে নিয়ে বসলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই আবার জমিদারী সংক্রান্ত কাজে গড়চত্বর মহালে যেতে হল। ফেরবার মুখে খবর পেলাম সুরবালা আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে চলে গেছে।

তার মানে? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

যে লোকটি নুটুবিহারির কাছ থেকে খবর এনেছিলেন সে মাথা নিচু করে রইল।

আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম সুদাসপুর মহালের দিকে। গিয়ে দেখলাম ঘর শূন্য পাখি পালিয়েছে—না, শূন্য নয়। নুটুবিহারী আছে। জাজিমের পর বসে ভাড়ে মদ ঢালছে। আমাকে দেখে কোন রকমে কাছাকোছা সামলে ছুটে এল, দাদা।

জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার জোর করে নিয়ে গেছে?

জোর করে নিয়ে যাবার লোক সে নয়। ওই স্বেচ্ছায় গেছে।

হুঁ। নিজের ওপর আর জোর রইল না।

এই তো সেদিনও স্যাঁকরা ডেকে মোহর কেটে পাথব বসিয়ে হার গড়িয়ে দিয়ে গেলাম। নারী আর নদী বিশ্বাস রাখতে জানে না।

ঘোড়া ফিরিয়ে চলে আসছিলাম। নুটুবিহারী ডাকল, দাদা—

পিছনে না-ফিরে বললাম, বলো।

আমি আর এখানে থেকে কি করবো?

তুমিই জানো।

আমিও আপনার সঙ্গে যাই না—

এসো। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আসতে বললাম বটে কিন্তু ও না এলেই ভালো হত। বড়লোকের নষ্ট ছেলে। সম্পত্তির সবটুকু ফুঁকে দিয়েছে প-বর্গের অন্ত বর্ণে। সুদাসপুরে থেকে সুরবালার দেখাশোনা করত। মাইফেলে সুরবালা ঠুমরি ধরলে তবলায় ও বোল তুলত। চমৎকার হাত। শুধু তবলায় নয় তাসেও। প্রবাসে আমার দোসর।

মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা ন্টুবিহারীর ভাবনা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সুরবালার বিশ্বাসহীনতা মন্দাকিনীর সম্পর্কে আরো সন্দেহাতুর করে তুলল। অবশ্য এর কোন কারণ ছিল না। তবু বিভ্রান্ত হয়ে মরলাম। অকারণ একটা ঈর্যা ক্রুর সন্দেহ হয়ে আমাকে শীতল হাতে স্পর্শ করে যেতে লাগল।

আজ অনেক বয়েস পার হয়ে এসে মনে হয়েছে, মহৎ কোন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগ না থাকলে মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয়।

আমার মনের হিসেব-নিকেশ মন্দাকিনীকে নিয়ে পড়ল। অথচ সরল মেয়ে তার কিছু বুঝল। কিছু বুঝল না। স্বামীর ব্যবহারে দগ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না তার।

সেই দিনটার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। মন্দাকিনীকে কাছে ডেকে আদর করে বললাম, বাইরে যাচ্ছি।

কবে ফিরবে? অবাক হল মন্দাকিনী, এই তো সে দিন এলে!

সন্ধ্যেবেলায়।

সত্যি তো?

হাসলাম একটু। তারপর ঘরের বাইরে এসে শিকল তুলে দিলাম।

মন্দাকিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, একি! দরজা বন্ধ করলে কেন?

তোমাকে আর বাইরে রাখতে ভয় করে।

তা' বলে সারাদিন আমাকে বন্ধ করে রাখবে?

কেমন অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলাম।

খুলে দাও। খুলে দাও বলছি। পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিল মন্দাকিনী।

বিড়বিড় করে বললাম, তোমাকে পাপ থেকে পাপের প্রলোভন থেকে আমার সন্দেহ আর ঈর্ষা থেকে বাঁচাতে চাই। তোমার সৌন্দর্য তো আগুন! পতঙ্গের দল ঝাঁপ দেবার জন্য মোহগ্রস্ত।

মন্ত্র পড়ে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছি। তাকে পূর্ণ করতেই হবে।

বেরিয়ে পড়লাম। জানালার গরাদ ধরে অপলক হয়ে রইল মন্দাকিনী।

শম্ভু বেরাকে বলে গেলাম, কেউ যেন বৌদিদির মহলে না যায়।

সারাদিন একলা সেই পাষাণপুরীর মহলে মন্দাকিনী কি করে দিন কাটালো সেই জানে।

তখন আষাঢ় মাস এসে গেছে। গড়সামন্তপুরের মাঠে মেঘ এসেছে নেমে। পূব হাওয়ায় কদমের গন্ধ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে মন্দাকিনীর জানালার কাছে। বোধহয় সারাদিন সেই কদমগাছের দিকে চেয়ে ওব দিন কেটেছে। কিংবা নিস্ফল আক্রোশে মাথা কুটেছে দরজার গায় ; যৌবনের বিশ্বাস নিরুদ্ধ অভিমানের কান্নায় গুমরে উঠেছে, হয়তো মেহগ্নির মঞ্জুষা থেকে ব্যর্থ আক্রোশে অলংকার বের করে ছুঁড়েছে ফেলেছে মাটিতে।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। গড়সামন্তপুরের মাঠে জামঘোষ প্রথম প্রহর ঘোষণা করছে। ব্যাঙের ঐক্যতান পুরোদমে জমজমাট।

সদরে ঘোড়া রেখে মন্দাকিনীর মহলে উঠে এলাম। এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মন্দাকিনীর ঘর অন্ধকার। জানালার কাছে গেলাম। ঘরের ভেতর মন্দাকিনীর ছায়া-দেহ দেখা গেল। জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কি ভাবছে সেই জানে। বাতাসে চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

বুকের মধ্যে সারাদিন ধরে যে ব্যথা অনুভব হয়েছিল এই মুহূর্তে সেটা যন্ত্রণা হয়ে উঠল। আমার বড় আদরের মন্দাকিনীকে আমি একি করেছি। কি নির্মম আমি! আমার সন্দেহ ঈর্ষার ফেনিলজ্বালা নির্দোষ বালিকাকে জীর্ণ করে ফেলছে। স্বেচ্ছাচারের হাতে আমি কি পুতুল—হা ঈশ্বর!

না, আর নয়। এখানে থেকে দূর কোন নির্জনে গিয়ে দু'জনে মুক্তি নেব। অহরহ এই সন্দেহ এই ঈর্ষার হাত থেকে পরিত্রান চাই।

দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে ঢুকে ডাকলাম, মন্দাকিনী—সাড়া দিল না সে।

এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রাখলাম। অনুতাপের আভাস আমার সেই স্পর্শে। তবু তাকালো না সে। আবেগ ঢেলে আবার ডাকলাম, মন্দা—আমার মন্দাকিনী!

হঠাৎ ফিরে তাকালো আমার দিকে। মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় ওর চোখে দেখলাম তীব্র জ্বালা। মৃদুকণ্ঠে বললে, কি চাও?

বাজের আওয়াজে নির্জনতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। গড়সামন্তপুরের মাঠ অন্ধকারের সন্ত্রস্ত আয়োজনের মধ্যে মুহূর্তে জেগে উঠে ডুবে গেল।

মনে হল বলি, তোমাকে চাই। পারলাম না। কেমন বাধো-বাধো ঠেকল।

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মন্দাকিনী

আমি বললাম, ক্ষমা করো।

আমি তোমাকে ক্ষমা করার কে? অভিমানে ভেজা মন্দাকিনীর গলা, কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে—মুখ আরো নামিয়ে নিল সে, এমন করে আমাকে নিচে নামিয়ে দিলে! তোমার সন্দেহ-সংশয় দিয়ে আমাকে এমন করে ঘিরে রেখেছ কেন? কখনো কি তোমার বিশ্বাস নষ্ট করেছি?

বুঝতে পারলাম মন্দাকিনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মন্দা। এই ডাকের মধ্যে আমার সব কৃতকর্ম অনুশোচনায় বিগলিত হয়ে গেছিল। ওর গায় হাত দিতে গেলাম।

না। আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো মন্দাকিনী, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি পাপ। তুমি আমাকে মুক্তি দাও—ঈর্ষা থেকে দাহ থেকে

সন্দেহ থেকে মুক্তি দাও। নিজের ইচ্ছে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই।

মন্দা। আবার ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

যাও। কাঁধ থেকে আমার হাত জোর করে নামিয়ে দিল মন্দাকিনী।

মন্দা। আবাব ডাকলাম। আজ সব অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার ভুলকে ক্ষমা করো।

না-না-না। মন্দাকিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই আসন্ন বৃষ্টির রাত্রে ওর কণ্ঠে যেন অনৈসর্গিক অভাস পেলাম। আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মন্দাকিনী। অন্ধকারে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। চোখের কাছটা একটু কেটেও গেছিল। আজ ঠিক মনে নেই। মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মন্দাকিনী। ও বোধহয় পাগল হয়ে গেছিল।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন। বাতাসের একটা নিস্ফল আর্তনাদ বাড়ির দেওয়ালে মাথা কুটে ফুঁসে উঠছে। আর বাজের মাথায় বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে।

সেই টেবিলটা এখনো তেমনি পাতা আছে। এইখানে এসে বসে খাস চাকর শম্ভু বেরাকে ডাক দিলাম। টেবিলের ওপর আলো রেখে গেল সে। সেদিন মাথায় হাত দিয়ে কি সব ভেবেছিলাম তার একটুকুও মনে নেই। তবে এ'টুকু মনে আছে সেকস্‌পীয়রের নামটা একবার মনে এসেছিল কেননা তার কোন নাটকের নায়ক যেন জীবনকে তাৎপর্যহীন বলে বর্ণনা করেছে।

দেরাজ থেকে বোতল আর গ্লাস নামিয়ে নিয়ে এলাম। মন্দাকিনী ঘরের মধ্যে কি করছিল জানি না। বাইরে একা আমি বোতলটা নিঃশেষ করে আনছিলাম। এক-একটা মুহূর্তে যন্ত্রণা এত গভীর হয় যে জীবন সম্পর্কে কোন মমতা থাকে না।

ঝড়ের ঝাপটা এসে লাগছে গায়। গড়খাই নদী এমনিতেই

কেঁপেছিল। বৃষ্টির জল পাড়ের বাধাটুকু আর মানছে না। গড়সামন্তপুরের মাঠে উঠে এসেছে। তারি শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে।

নেশাটা এমন জমে এসেছিল চোখ মেলে আর তাকাতে চাইছিলাম না। এমন সময় সিঁড়ির ওখান থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, দাদা আছেন নাকি।

কে? চমকে উঠলাম।

সেই মুহূর্তে গায়ের উপর দিয়ে বিদ্যুতের আলো ঝলসে গেল। তারপরই রাত্রির আত্মাকে কাঁপিয়ে শব্দের বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দেয়ার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম নুটুবিহারী এসে দাঁড়িয়েছে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, কি, কি চাই তোমার?

বাধ্য হয়েই দাদার নন্দনকাননে হানা দিতে হল। আমার কথার অপেক্ষা না-রেখে সামনের দিয়ে এগিয়ে এল সে, বৃষ্টির দিনে তেষ্টায় আর বাঁচিনে!

কবে ফিরলে?

আজ সন্ধ্যের আগে। শুনলাম আপনি এসেছেন অথচ নামছেন না, তাই ভাবলাম। একটু জড়সড়ো উত্তর দেয় নুটুবিহারী।

গেলাসটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে!

আপনি?

দরকার নেই।

রাগ করলেন নাকি দাদা? বিবর্ণ হাসল নুটুবিহারী!

না। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকালাম। নুটুবিহারীর স্পর্ধায় আশ্চর্য হয়েছিলাম। এত সাহস ওর হল কি করে। প্যারাডাইস লষ্টের নায়কের সঙ্গে নুটুবিহারীর আত্মীয়তা আছে নাকি!

দাদার পেসাদ। গেলাস মাথায় ঠেকিয়ে ঠোঁটের সামনে ধরল নুটুবিহারী।

ওর দিকে তাকিয়ে ঘৃণা হল। অনেক ছিল। সব শেষ করে এখন নির্লজ্জের মতো প্রসাদ ভিক্ষে করে ফিরছে। আর মোসায়েবীটা এমন রপ্ত করেছে মনে হয় ওটা ওর পেশা। বয়েসে কয়েক বছরের ছোট। দাদা বলেই ডাকে। এক স্কুলেই পড়েছি ছোটবেলায়। কিছু বলতে পারিনে। অথচ ইচ্ছে করছিল এক্ষুনি শম্ভু বেরাকে ডেকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে বলি।

সে সময় এ সব কথা কেন মনে হয়েছিল জানিনে। বোধহয় ওর জন্যেই মন্দাকিনী মন থেকে সরে গেছিল। এরি মধ্যে মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম মন্দাকিনীর সঙ্গে অশান্তি মিটিয়ে নেব। ওকে বলব, যে সন্দেহ ফেনিয়ে তুলে অ-সুখে মরছি তাকে শেষ করে দিতে চাই। আমাকে যত খুশি দুঃখ দাও তোমাকে দুঃখ দিয়ে নিজে আর দুঃখ পেতে চাই না। মাথা তোল। আমার দিকে চাও। চেয়ে দেখ—দেখেও বোঝনি, আমার অন্তরে যে ভালবাসা চোখে তারি আলো!

ন্টুবিহারীকে তাড়িয়ে দিয়ে উঠতে যাবো এমন সময় পকেট থেকে একটা তাসের প্যাকেট বের করে আমার সামনে ফেলল। হ্যারিকেনের আলো তার ওপর পড়ে পিছলে গেল। প্যাকেট খুলে দু'হাতে আধাআধি ভাগ করে অবহেলার সঙ্গে সাফলিং করতে সুরু করে দিল, নতুন কিনে আনলাম।

তাস ভাঁজার শব্দটা কানে ভারি মিষ্টি ঠেকল।

এক হাত হবে নাকি দাদা?

না—বলতে পারলাম না।

কি খেলবেন বলুন? ব্রে, ব্রিজ—

ব্রিজ হোক। গম্ভীর গলায় উত্তর দিলাম।

গুছিয়ে বসল ন্টুবিহারী, সিগারেট চলতে পারে? সম্মতির জন্যে মুখের দিকে তাকালো।

না।

বৌদি ঘরে বুঝি?

উত্তর দিলাম না।

সেই অলৌকিক বৃষ্টির রাত্রে পৃথিবীতে বোধহয় আমরা তু'জন ছাড়া কেউ জেগেছিল না। মুটুবিহারীর চোখে একটা নিরাকার হাসি জটিল হয়ে মুছে যাচ্ছে। বোতলটা একসময় শেষ হয়ে গেল।

নতুন একটা আম্নন দাদা।

সারা রাত চালাবে নাকি?

হাসলো সে। হেসে নিজের মনে তাস সাফলিং করে চলল।

নতুন বোতল এনে সামনে রাখলাম। কর্ক ওপনার দিয়ে মুটুবিহারী বোতল খুলে ফেলল। তারপর টেবিলের তলা থেকে সোডার বোতল বের করে বলল, ত্য লাষ্ট।

আমার নিজের কাঁচা মদে আপত্তি ছিল না। এমনিতে বুকের ভেতরটা জ্বলছিল। মদের জ্বালা আর কতোখানি পোড়াবে। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে।

ঝড়ের গোঙানি তখনো শঙ্খচূড় সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। বিদ্যুতের আলোয় তু'জনে তু'জনের দিকে চেয়ে দেখছি। অনেকক্ষণ ধরে ব্রিজ চলল। বার বার হেরে যাচ্ছে মুটু। হঠাৎ বলল, বিনা পয়সায় তাস খেলাটা বেগার দেবার সামিল। মন বসে না কিছুতে। অলীক একটা হাসি ফোটালো মুখে।

তার মানে? আমি লাল-চোখে ঝুঁকে-পড়া মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম।

মানে? একটু ইতস্তত করল মুটুবিহারী, পয়সা না হলে ঠিক জমে না।

সোজা হয়ে বসলাম, আমার আপত্তি নেই। মুটুবিহারীর কথা কেমন বাঁকা লাগল। কি আছে তোমার?

আবার হাসলো সে। মাথাটা অকারণ নেড়ে কোচা ঝেড়ে পকেটে রাখল, দাদার মতো সামর্থ নেই। তবে একেবারে—

দেখি ?

পকেট থেকে আখরোটের কাশ্মিরী কাজ-করা বাক্‌সো বের করে দিল, দেখুন—

বাক্‌সোটা আমার হাতে দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা একটু নামিয়ে দিল। বাক্‌সো খুলতেই একরাশ আলো চমকে উঠল। আশ্চর্য সব পাথর। চার-পাঁচটা। আমি হাত দিয়ে তুলতে যাচ্ছিলাম। হাত চেপে ধরে পকেট থেকে হাতির দাঁতের ছোট্ট একটা ফুলতোলা চুলের কাঁটা হাতে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে দেখুন।

ওর দিকে তাকালাম। ভালো করে মাথা তুলতে পারছি না। নুটবিহারী ততক্ষণে সাফলিং-এ মন দিয়েছে।

কোথায় পেলে ?

লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে ছিল। কিছু তো আর নেই। এই এক-আধটু আছে, যা দেবি খুঁজে-পেতে নিয়ে যেতে পারেন নি !

আজ সন্ধ্যেবেলায় এনেছ ?

হুঁ।

আমি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না তাই জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো তুমি-বাজিতে ধরবে ?

আপত্তি নেই।

আমায় কি ধরতে বলো ?

আপনি বলুন !

আমার সুদাসপুরের মহাল।

ফুঃ। আমাকে বুঝি ব্যঙ্গ করতে চাইল নুটুবিহারী।

বেশ গড়সামন্তপুরও রাখলাম।

মাথা নাড়ল সে। এমন ভাবে নাড়লো ইচ্ছে-অনিচ্ছে কোনটার মধ্যেই ধরা না-পড়ে।

নগদ টাকা ?

কি রকম যেন বিকৃত হেসে তাস ভেঁজে যেতে লাগল সে।

আচ্ছা, সামন্তপুর আর অস্থাবর সব সম্পত্তি বাজি রাখলাম।

মাথা নাড়ল সে।

তবে ? চেঁচিয়ে উঠলাম।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের আলো ঝলসে গেল। বৃষ্টির একটানা শব্দে কেমন-একটা নেশা লাগছে। আমার চোখের সামনে পাথর-গুলো নাড়তে লাগল নুটুবিহারী। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় রঙের বিকীরণ স্বয়ম্বর সভার মতো বিচিত্র হয়ে উঠল। মনের মধ্যে লুব্ধতা বাঁধ ভাঙা জলের বেগ নিয়ে দুর্বার অনুভব দিল।

আবার বাক্সোটা বন্ধ করে তাস নিয়ে বসল নুটুবিহারী। বারবার সাফলিং করে চলেছে। নিজের মধ্যে উন্মাদ হয়ে উঠলাম। নুটুবিহারী আমাকে খেয়াল করছে না। গেলাস থেকে একটু করে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। কখনো আমার অলক্ষ্যে আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করছে।

আমার এর বেশি কিছু নেই।

ও কি রকম একটু বিষণ্ণ হেসে আমার দিকে তাকালো। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নিচু করে তাস গোছাতে লাগল। বোধহয় নতুন করে সাফলিং করবার জন্যে। উঠে যাবার জন্যেও হতে পারে। আমার কথায় নুটুবিহারী কোন উত্তর দিল না। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল। অথচ কোন উপায় নেই। নিজের উপর নিজের রাগ হয়ে যাচ্ছিল। শেষে মরীয়া হয়ে ডাকলাম, নুটু—

দাদা।

কি চাও তুমি স্পষ্ট করে বলো ? ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলাম। কোন উত্তর দিল না নুটুবিহারী। আর সেই সময়েই মন্দাকিনীর কথা মনে এল। আর বলেও ফেললাম, আমার বাজি মন্দাকিনী—। বিশ্বাস করুন কিছুতেই একথা আমি বলতে চাইনি। তিনটে শব্দের একটা ভুল। তিরিশ বছর প্রায়শ্চিত্ত করেও তার পাপ শোধরালো না।

ঘুটু চেয়ার থেকে উঠে বলল, তার মানে ?

যদি জিততে পারো আজ—

সেই মুহূর্তে ক্ষেপা বাতাস বৃষ্টির জল মাথায় করে খোলা বারান্দায় ঢুকে পড়ল।

পায়রাগুলো ভয়ে ডেকে উঠে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তাদের গম্ভীর অথচ ত্রস্ত অনৈসর্গিক আওয়াজে অন্ধকারের মুখে ভয়ের রেখা জেগে উঠল। আর গড়খাই নদীর স্রোত তলা খেয়ে মাটির একটা জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিল।

চেয়ারে বসে পড়ল নুটবিহারী। ওর ঠোঁট বুঝি ঝুলে পড়েছিল। কি রকম দুর্বোধ্য চোখে আমার দিকে তাকালো।

বললাম, ফিস্ হোক। ছুটকো মারে নয় ফুলহ্যাণ্ড মারে জয়-পরাজয় ঠিক হবে। দুজনে সাবধান হয়ে খেলছিলাম। যার যতটুকু হয়ে যাচ্ছিল নামিয়ে ফেলছিলাম। কেউ কাউকে এক মুহূর্তও বিশ্বাস করছিলাম না। চিতা যেমন নিঃশব্দে শিকারের দিকে তাকায় তেমনি সন্তর্পণে দুজনে দুজনের দিকে তাকাচ্ছি। নুটু-বিহারীর পরাজয় সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। ওর চোখ দুটো আরো ছোট হয়ে এসেছে। সেই আধ-খোলা চোখে রহস্য জটিল হয়ে আছে। আগের থেকে অনেক গম্ভীর। একটুও নড়ছে না নুটুবিহারী শুধু আঙ্গুলের ডগা দিয়ে তাসের মাথা একটুখানি করে সরিয়ে দেখছে। কখনো বোর্ডের তাসের দিকে কখনো আমার মুখের দিকে। আবার আমার দানের বেলায় গেলাস তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাচ্ছিল। নিঃশব্দে। নিজের অজান্তে। বোধহয় খাচ্ছিল। বোধহয় খাচ্ছিল না।

সেদিনকার খেলায় আরো একজনের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। সে কে জানিনে। অথচ তার অশরীর অস্তিত্ব দুর্বার কৌতূহলে টেবিলের বুকে ঝুঁকে পড়েছিল। কখনো তার নিঃশ্বাসের শব্দও স্পষ্ট যেন শুনতে পাচ্ছিলাম।

নুটুকে আমি চিনি। অনেক দিন খেলছি ওর সঙ্গে; 'মেড' হলে ওর বাঁ-হাত একটু কাঁপে। নাকটা অতিরিক্ত বাতাসে ফুলে ওঠে। গোঁফের কাছটা ওঠা-নামা করে।

সে দিন তার মুখে নির্বিকার একাগ্রতা। দুজনের ফিস হিসেবের খেলা। আমি নুটুবিহারীকে হারাচ্ছিলাম বারবার। লাভ হচ্ছিল না। পয়েন্টের ফ্যারাকে হার-জিতে লাভ ছিল না। বাজি ছিল ফুলহ্যাণ্ডের মারে খেলা আসান হবে।

রাত তখন ঝুলে পড়েছে। বড়ো ঘণ্টাগুলো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। নেশা একেবারে চুরচুর হয়ে এসেছে। একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। আমি তাস দিয়ে নিজের তাস গুছিয়ে নিলাম। নুটুবিহারী ফিস করে আমার মুখের দিকে তাকালো। তাসগুলো ঠিক বাগে আনতে পারছিলাম না। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নুটুবিহারী কি তাস ফেলেছে। এবারে সে আর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। নিজের তাস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মুখে কি রকম খেদোক্তির ছাপ। আমার অলক্ষ্যে তার ঠোঁট নড়ছিল তাতে কোন শব্দ ছিল না। নির্ভয়ে পা ফেললাম। নুটুবিহারী বোর্ড থেকে তুলে আবার সেই তাসই ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল। বোধহয় আমার ঠোঁটে একটু হাসি এসেছিল।

নুটুবিহারীর দিকে আর লক্ষ্য করবার প্রয়োজন ছিল না। দুটো বাদে আর সব তাস মেড্ হয়ে গেছে। খানিকটা নামিয়ে দিতে পারতাম একটু রিকস্ করলাম। নুটুর দান এল। বললাম, ফিস করো নুটু।

কি রকম একটু হাসল নুটু। একটু বাঁকা আর ভাঙা হাসি টুকরো-টুকরো হয়ে তার ঠোঁটে ফুটে উঠতে চাইল। নুটুর বাঁ-হাত থেকে তাসগুলো ঝরঝর করে টেবিলের উপর এলিয়ে পড়ল। নুটুবিহারী মাথা সোজা করে আমার দিকে তাকালো। তার ঝকঝকে পাঞ্জাবী হাওয়ায় কাঁপছে। তার কোঁচানো কাপড়ের

কোচা হাতে তুলে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা এগিয়ে গেল মন্দাকিনীর ঘরের দিকে, ওরি মধ্যে বোধহয় সময় করে একবার আমার দিকে তাকিয়েও নিয়েছিল।

এই তিরিশ বছর ধরে ভেবেছি সে সময় আমি কি জানোয়ার হয়ে গেছিলাম! আমার সমস্ত চেতনা লোপ পেয়েছিল নাকি? কেন আমি বাধা দিনি! কেন বিহ্বলতাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। হা ঈশ্বর! ইন্দ্র সামন্ত টেবিলে চপেটাঘাত করলেন, নেশার ঝোকে আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলেও কিছু ছিল না! তার গলা কান্নায় আবেগে বুঝি ভাঙা। অনেকক্ষণ মাথা নামিয়ে কি সব ভাবলেন।

আমি সিগারেটে টান দিয়ে বললাম, তারপর?

তারপর—এক মুহূর্ত থেমে সোজা হয়ে বসলেন ইন্দ্র সামন্ত, মন্দাকিনীর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল মুটু। আমার চোখের সামনে দিয়ে। এই চেয়ারে বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম আমি। এমন কি দরজা দেবার শব্দও শুনতে পেলাম।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছিল জানি না। ঘোর কেটে যেতে নেশা খানখান হয়ে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

সোজা এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারলাম, মন্দাকিনী—দরজা খোলো—

বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে সে শব্দ অন্য কোথাও পৌঁছেছিল কিনা জানি না; চাকরদের কারো সাড়া পেলাম না।

মরিয়া হয়ে ধাক্কা মারলাম। কখনো ক্লান্ত হয়ে দরজায় কান পাতছিলাম। ভিতরে কোন সাড়া নেই। দরজা একটুও কাঁপছে না। লোহাকাঠের কপাট। এক-একবার ক্লান্ত হয়ে দরজার গায় বসে পড়ছি।

আমার মনের অবস্থা তখন কল্পনা করতে পারছেন। সেই সময়টুকুর রাত্রি কি ভয়ঙ্কর হয়েই এসেছিল! যে মন্দাকিনী আমার ইহকাল-পরকাল তার দরজায় আমি কুটে মরছি। যাকে

আমি পৃথিবী থেকে নেপথ্যে রাখতে চেয়েছি তাকে নিজে কোথায় ঠেলে দিলাম!

শেষে দরজা যখন ভেঙে পড়ল রাত বোধহয় তখন শেষ হয়ে এসেছে। বন্দুক নিয়ে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ডাকলাম, মন্দাকিনী।

অন্ধকার ঘর থেকে কোন সাড়া এল না। পাগলের মতো হেসে উঠলাম। ইচ্ছে হল দুজনকেই চেঁচিয়ে বলি, ঈশ্বরের নাম নাও—

অন্ধকারেই ঘরের আনাচে-কানাচে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। না, কোথাও নেই। এবার হ্যারিকেন নিয়ে এলাম। হ্যারিকেন তুলে সমস্ত ঘর দেখলাম। আমার হাত থরথর করে কাঁপছিল। বুকের মধ্যে দারুণ একটা ভয় উদভ্রান্ত হয়ে গেছিল।

শূন্য ঘর। কেউ কোথাও নেই। হাত থেকে হ্যারিকেনটা পড়ে গেল। আশা ছেড়ে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি তখন কি মনে করে জানালার কাছে গেলাম। জানালার কাছে গিয়ে দেখি কাপড়ের পর কাপড় বাঁধা। লম্বা হয়ে জানালা থেকে ঝুলছে।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। ক্লান্ত চাঁদ একটুখানি আলো হাতে নিয়ে মেঘের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে। গড়সামন্তপুরের মাঠ আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

নিচে নেমে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে শেষ চেষ্টা করতে ছুটলাম। ভাবলাম এখনো বোধহয় ওদের ধরতে পারি। কিন্তু বৃথা। খুঁজে পেলাম না। পাবো না সে তো আমিও জানতাম। ইন্দ্র সামন্ত হেসে উঠলেন।

সেই হাসির শব্দে পায়রাগুলো কেঁপে উঠল।

বিশ্বাস করুন আপনি ওদের আমি খুঁজে পাইনি। বাড়ি ফিরে কয়েকদিন আর ঘর থেকে বের হতে পারলাম না। তারপর যখন বেরুলাম সবাই আমাকে ভয় পায়। যাকে বলতে যাই সেই এড়িয়ে যায়। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারি নি! অথচ তিরিশ বছর ধরে

এই কথাটি বলতে চেয়েছি। সবাই আমাকে খুনী ভাবে। পাগল ভাবে। কিন্তু কেউ জানে না কি যন্ত্রণা নিয়ে এই প্রেত-পুরীতে নিঃসঙ্গ প্রেতাত্মার মতো বেঁচে আছি। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন ইন্দ্র সামন্ত ;·আমার হাত ধরে বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন আমি খুন করি নি—!

আমি বিহ্বল হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দাকিনীর সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়নি ?

বৃদ্ধ সামন্ত তার পিঙ্গল চোখ দুটো আমার সামনে মেলে রাখলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, হয়েছিল।

হয়েছিল! সোজা হয়ে বসলাম, যদি আপত্তি না থাকে—

তা' হলে বিন্দি-ঝির জবানবন্দীর শেষটুকু শুনে নিতে হবে প্রথমে—

আপত্তি কি ? গুছিয়ে বসলাম।

গেলাসের তলানিটা গলায় ঢেলে দিয়ে ইন্দ্র সামন্ত সবে সুরু করেছেন, সেটা ১৯২৫ সাল—

হঠাৎ আমার নাম ধরে নিচে প্রচণ্ড হাঁকডাক সুরু হয়ে গেল। গলার স্বর পালটে গেল ইন্দ্র সামন্তের, নকীবপুরে ওরা আপনার খোঁজে এসেছেন।

তা হলে ? অসহায় ভাবে তাকালাম সামন্ত মশাই-এর দিকে।

বিষণ্ণ হাসলেন তিনি। অথচ এমন হাসি তাঁকে মানায় না।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে এল। আর বহুজনের উপস্থিতির উচ্চকিত সংলাপ, সামন্ত মশাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসা, আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সব মিলে সুরু হল কোলাহল।

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইন্দ্র সামন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গড়সামন্তপুরের মাঠে নেমে এলাম। উপাখ্যান অসমাপ্ত রেখে।

আজকেও বৃষ্টি থেমে গেছে। চাঁদ ওঠেনি। ব্যাঙের ডাক অন্ধকারে দরবারী ধরেছে। জানিনে পায়ে-পায়ে বোধহয় নকীবপুরের পথ ধরেছি।

মনে একটি খেদ: মন্দাকিনীর গল্পের শেষটুকু আর শোনা হল না।

হিংস্র জলের রূপকথা



আসমান যেন্ হাড়ির পাছার নাগাল কালা! নিজের ঘরের হাতনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে তেম্নি, ভালো ঠেয়ে না। কি যেন এট্টা হবে মনে নয়!

কালো মেঘে জল ঝরে চকচকে একটা ছায়া এসেছে। দেখলে ভয় করে। তারপর গত কয়েকদিনের বৃষ্টি পথ-মাঠ ডুবিয়ে দিয়েছে।

মানুষটা ভাইটেপাড়ায় গরুর চালান তুলে দিতে গেছে। আজও ফেরেনি। শুনেছে মধুমতীর ঘোলা পানি ক্ষেপে পুব-পশ্চিমে টানা-স্রোতের বুক চিতিয়ে দিয়েছে। মামুদপুরের কচুরিপানা কামঠানার মাঠে হানা দিয়েছে।

আজ মাসখানেক ধরে দেখছে তেম্নি উল্লাপিপ্ড়েরা দল বেঁধে খুঁটির গা থেকে উপরে উঠছে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল এবার জবর ঢল নামবে।

জায়গাটা এমনিতে কিছু জলা নয়। খাল-নাল আছে অনেক। বর্ষায় যখন ঢল নামে তখন বিলগুলো একাকার হয়ে যায়। কচকচে কালো জল গতরের আলিস্যি ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলে। মাথায় কচুরির ঘন ঝোপঝাড়। বেগনি ফুলে তার বাহার খোলে। সেই মাজা কালো-জলের বুকে মানুষের বসতি বিন্দুর মতো জেগে থাকে।

এবার বন্যে এসেছে। নদীর জল আগেই পাউড়ি সমান উতলে উঠেছিল। ঢল নামার সঙ্গেই ফেঁপে উঠল। কালনাগিনী কালীগাঙ। মেটেগোখরো নবগাঙ। আর আড়োলবেয়া মধুমতী। তিন নদীর উলটিপালটি আর ফোঁসানিতে মানুষ-জন আগেই এলাকা ছেড়ে ফেরার!

হানোর মা-মরা ছেলেটা এসে খবর দিয়ে যেত। আজ ক'দিন তারও পাত্তা নেই। সেই কয়েকদিন আগে এসে বলল, ও বু' শুনছিস মধুমতী ফাইপে উঠে কন্দে'র খালের ভিতরি সেধোইছে—

সত্যি কোস্ তো? তেন্নির বুক ভয়ে কাঁপে।

তুই ভাবিছিস চাটাম। মুখ বেজার করে ছেলেটা, হুঁ-উ, লোহাগড়ার বাজারের কাছে গাছগাছালি দিয়ে বান্দ্ দে'ছেলো মিয়ারা—এয়ে ঘাপানে ভাসায় নেছে!

খবর যে আরো কত রকম আসছে তার ঠিকানা নেই। কয়ের বিলের জল তুষখালির দোয়া ভরে দিয়েছে। বাইরপাড়া দেবি-সরশুনো জলের তলায়।

শুনে ভয় পেয়েছে তেন্নি বিবি।

নবগঙ্গার ওপার আগেই ডুবে গেছে। ধুপাদা চোরখালি জয়পুর নারাণদে বিষ্টুপুরো সব ভেসে গেছে।

এপার একটু উঁচু তাই জল উঠলেও কাশিপুর এখনো ডোবেনি।

জলের উপর কালো মেঘের ছায়া পিছলে যাচ্ছে। দাড় কাউয়োর মতো রঙের জেল্লা। সামনে সোঁদরালি গাছের গা বেয়ে

আমগুরুজের লতা ফেনিয়ে উঠেছে। আকাশের সবটুকু দেখা যায় না। যা দেখা যায় তাতেই বুকের ভেতর ভয় জমে।

দুপুরে কোন রকমে ভাত রেঁধে রেখেছে। পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে তাই রাতে খাবে। উঠোনের উপর দিয়ে জলের স্রোত চলেছে।

স্রোতের সঙ্গে তেলোটাকি খয়রা চেলামাছ ভেসে আসছে, উজিয়ে যাচ্ছে কইমাছের ঝাঁক। বিলের নিঝেল টলটলে জল। জলে নামলে ধরা যায়। লাভ কি! তেল কোথায়!

সন্ধ্যের মুখোমুখি বাতাস দেয়া আর জলের মুহোড় চলেছে। হাতনের সামনে থেকে সরে গেল তেন্নি বিবি। কলসের কান্ধায় জল পড়ছে। গাবুর-গুবুর। গাবুর-গুবুর।

জলের ছাট আসছে এক নাগাড়ে। পোকামাকড় ব্যাঙ বিছে হাতনের উপর উঠে আসছে। ডোয়া খেয়ে খুঁটির গা বেরিয়ে পড়ছে। বাতাসের দাপে ঘর কাঁপছে। ভেঙে না পড়ে!

একটু দূরে কোথায় হল্লা শোনা গেল। তেন্নির বুঝল কার ঘর ভেঙে পড়ল। খুব কাছাকাছি। দু-একটা ডাকও শোনা যাচ্ছে, ওরে সাইজে-ভাই ফ্যাৎ অরে আসো-ও-ও-ও।

সদর রাস্তায়ও হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কেউ বোধহয় গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে।

না, এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না। ঘরে উঠে গেল তেন্নি! বেঁকি-বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিজে বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কুপি নিভে যায় বুঝি, কাপড় দিয়ে আলো সামলায়! কাদা-কিচেড়ে পা খেয়ে সাদা হয়ে গেছে।

ঘরে বসে মানুষের হল্লা শুনতে পায় তেন্নি। এক-একবার ঝড়ের বাতাস বিমূঢ় মানুষের আর্তনাদ ভাসিয়ে আনছে।

খবর পেয়েছে অনেকের ঘর পড়ে গেছে। নতুন রোয়া ধান বানমাছের প্যাটের মতো সাদা হয়ে জলের তলায় ডুবে আছে। ধানের জন্যে তেন্নির তেমন ভাবনা নয়। ওর মানুষটা ব্যাপারী।

কাঁচা পয়সার লেনদেন সব সময়। মানুষটার কি হল কে জানে! ভাইটে পাড়ার ঢোনের কাছে মধুমতীর স্রোত খল্লামাছের মতো ঝাক বেঁধে পাক খেয়ে ফিরছে। মানুষ গরু খেয়ানৌকো পড়লে রক্ষে নেই। তেন্নির গতর ধানের বালেনের মতো শিরশির করে। ভয়-ভাবনা নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছে সেই জানে। মানুষগুলো যে যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত। তেন্নির কথা কারো মনে নেই। যার নাই ভাতার পুত তার নাই কেউ।

আর একবার চীৎকার ভেসে এল!

ঘর পড়ল না বন্যের জল এল! হয়তো নবগঙ্গা কূল ছাপিয়ে উঠে আসছে। বিলের জলও হামাগুঁড়ি দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলে-জলে কাইজে। কালীগাঙ টাবরা-নন্দখোলের বিলের তলা দিয়ে এসে এড়েন্দার খালে কুচে মোড় খাচ্ছে।

আল্লা! ফিসফিস করে তেন্নি।

আবার বিশৃঙ্খল হল্লা বাতাসে তেন্নির ঘরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। বেঁকিবেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

পোঁতার মাটি একেবারে ভিজে গেছে। জল উঠছে।

বাইরে গা-ঝাড়ার শব্দে বুঝতে পারে শেয়ালগুলো জল ঝাপিয়ে বারান্দায় এসে উঠছে।

মাচার ওপর গায়ের কাপড় জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে তেন্নি। আবার জল ভাঙার শব্দ পায়। কান খাড়া করে থাকে।

একটু পরেই দরজায় আওয়াজ হল! ভিজে ফ্যাসফ্যাসে একটা গলার স্বর তার কানের পাশ দিয়ে ভেসে গেল যেন!

শিয়েল নাকি কবে কিডা! নিজের মনে বুঝি জিজ্ঞেস করে তেন্নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার দরজায় খুটখুট শব্দের মতো মনে হল।

হঠাৎ কুপিটা নিভে গেল। সামলাতে পারে না তেন্নি।

ভয় অরে। নিজের মনে স্বগতোক্তি করে তেন্নি, মানুষ নাকি কবে কিডা!

ডোয়ার খানিকটা ভেঙে পড়ল জলে।

তেন্নি—ও তেন্‌নি দরজা খোল্।

কিডা, গলায় সাহস আনে তেন্নি।

আমি। স্পষ্ট মানুষের গলা।

আমি কিডা? আর কোন সাড়া নেই।

একটা মুখের কথা মনে হল তেন্নির; যৌবনের সুরু থেকে উপদ্রব হয়ে আছে।

খোল্, দরজা খোল্।

ক্যান্, দরকার কি?

তোরে।

ক্যা?

বুঝিসনে!

ঝড়বৃষ্টির দিনে গলা ফাটানিতে কাউকে পাওয়া যাবে না।

দরজা খোল্। জোরে করাঘাত পড়ে দরজায়, বিষ্টিতে ভিজে মলাম্!

না, খোলবো না। একটু শক্ত হয় তেন্নি যদি ফিরে যায়!

কিন্তু তা হলো না। দরজায় লাথি পড়ল। আর সুপুরির চালি-বাঁধা দরজা ফাঁক হয়ে গেল।

অন্ধকারেই ভিতরে চলে এল মানুষটা; তেন্নির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা মাইয়েমানুষ তো তুই! কুপিটুপি জ্বাল দেহি।

কুপি ধরিয়ে তাকালো তেন্নি: দাড়িভরা মুখ। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ভিজে লেপটে গেছে। কিষেণ-খাটা মানুষ। বুকের ও হাতের পেষি উঁচু হয়ে আছে। কোমরে একটা ধারালো দা।

ছিড়া থামি থায়ে তো দে দিন্। তেন্নির দেবার অপেক্ষা না-করে

নিজেই দড়ি থেকে একটা লুঙি টেনে নিল, ও তেন্নি শুনিছিস নবগঙ্গার জল মাঠ তামাৎ হাইটে আইছে।

: মাথা নাড়ে তেন্নি, না।

খোজ পালাম এল্‌লা আছিস, তাই আলাম। তেন্নির চোখে চোখ রাখে ছায়েম, আগুনডা দে দি বিড়ি ধরাই। একগাল ধোঁয়ার খানিকটা নাক দিয়ে খানিকটা মুখ দিয়ে ছেড়ে-ছড়িয়ে ছায়েম বলল, ডাহুর গোস্ত—বিড়িতে আর একবার টান দিতে গিয়ে হাত নামিয়ে বলল, বুয়ালমাছে খাতিছে—হলদে ছোপধরা দাঁত বের করে হাসল, তোর ইবার কোন আপত্ত শোনবো না কিন্তুক কয়ে থুলাম।

উত্তর দিল না তেন্নি।

বড় মানষির ঘরে আছিস।

উঁ। অজান্তে সায় দিয়ে লজ্জিত হয় তেন্নি। আরো জড়সড়ো হয়ে বসে।

এতক্ষণে মানুষটাকে পুরোপুরি মনের মধ্যে আনতে পেরেছে। লোকটা ছায়েম। কি একটা ব্যাপারে ডাহুর সঙ্গে জমি নিয়ে তার ঝগড়া। সুরু হয় কথা কাটাকাটি দিয়ে শেষ হল খুনোখুনিতে! দু'একটা লাশও পড়েছিল। ডাহুও যেত ছায়েমের কোপে; একটা কানের উপর দিয়েই সরে গেছে তার কোপ। তারপরই লোকজন এসে ঠেকিয়ে দেয়।

চুলি খোসবু তেল দিছিস বুঝি! চোখ বড়োবড় করে তাকায় ছায়েম, ভয় পাচ্ছিস নাকি?

মোটামুটি মেয়াদে জেল হয়ে গেল ছায়েমের—সেও আজ সাত-আট বছর আগেকার কথা। ছায়েম জেলে যাবার পর কাঁচা পয়সার লোভ দেখিয়ে ডাহু ছায়েমের ভালবাসার মানুষটিকে লুঠ করে নিল। তেন্নির বাপ ওমেদ মিয়া অভাবি মানুষ। হাতে কড়কড়ে টাকা পেয়ে রাজি হয়ে গেল।

কাছে আয়। তেন্নির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ছায়েম। তেন্নি জানে বাধা দিতে গেলে আরো ফুঁসে উঠবে। আরো বেশি করে জোর করবে।

তেন্নির নিজের ইচ্ছা ছিল না ডাহুর সঙ্গে বিয়ে হয়। বাপ কিছুতেই কথা শুনলো না। বিয়ে হল। বিয়ের পর এক ছেলে হল। ছেলেটা মরে গেছে। বাড়ির কাছে সোঁদরালি গাছের তলায় তার কবর! তারপর কতোদিন কেটে গেছে ছায়েমের সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছে জেল থেকে ফিরেছে।

কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল ছায়েম।

এক ঘর অন্ধকারের তলায় ডুবে গেল তুজনে। বাইরে একরোখা বাতাস ঘরের উপর বৃষ্টি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে।

রাত কত হবে কেউ জানে না।

তেন্নির হাতের ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল ছায়েমের। চোখ মেলেই মাচার উপর লাফ দিয়ে উঠল, ডাহু মিয়া নায়ি?

না, ফিসফিস করল তেন্নি, চালির তলায় জল ঠেয়ে জেন্!

কোস্ কি? নড়েচড়ে বসে ছায়েম। তারপর পা নামিয়ে বলে, আল্লা।

জলের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

আলো জ্বালতি পারিস?

মালসা ভাইসে গেছে।

কুপি?

তাও, আশপাশ আবার হাতড়ালো তেন্নি, হাতে তো ঠেয়ে না।

বান আসলো নায়ি! ছায়েমের গলায় ভয় থমথম করে।

হবি হয়তো। ছায়েমের গা-ঘেঁষে বসে তেন্নি।

দুজনে চুপ করে থাকে। বাইরে জলের আওয়াজ চলাফেরা করছে। হয়তো কান পেতে তাই শোনে। মাঝে মাঝে মানুষের উত্তেজিত সংলাপের কিছু ভেসে আসছে। তারি মধ্যে কাছে পিঠে দড়ি-ছেঁড়া গরুর আর্ত হাম্বা।

মানুষজন গিরাম ছাড়তিছে বুঝি!

তেন্নি কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পরে ছায়েমই আবার বলল, শুনতিছিস? গরুবাছুর ছাইড়ে দিয়ে মানুষ পালাতিছে!

দুজনে দুজনের গা-ঘেঁষে বসে রইল। বাইরে জলের একাকার স্রোত মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে ফিরছে। বৃষ্টির শব্দের মধ্যে যখন ভয়-তরাসে মানুষের আর্তধ্বনি ছাপিয়ে উঠেছে তখন বুকের ভেতর দম আটকে আসে।

কী অরবা? অনেকক্ষণ বাদে কথা বলল তেন্নি।

বিহান হতি দে।

ঝপাৎ। ঝপ করে শব্দ হল একটা। চমকে ওঠে তেন্নি। পশ্চিমের দিকের বেড়া জলের মধ্যে পড়ে গেল। বাতাস এসে ঝাপিয়ে পড়ল ঘরে।

ও আল্লা। তেন্নির গলায় আর্তনাদের মতো বেজে উঠল শব্দটা।

মাচায় আর বসা যাবে না। চল ডাফের উপর উঠিগে।

তারপর?

আল্লা যা অরে!

মাচা থেকে দুজনে ডাফের উপর গিয়ে ওঠে। ছায়েম তেন্নিকে টেনে তুলে নেয়। তারপর সেই দুশ্চিন্তার রাত কি করে ভোর হল ওরাই জানে। বৃষ্টি না কমলেও ভোরের দিকে বাতাসের জোর কমে গেল।

ঘরের ভেতর কালো জলের কুটিল ইচ্ছে ঘোরা-ফেরা করছে।

সারারাত ধরে কুঁরে-কুঁরে ডোয়ার গা খেয়ে খুঁটি বের করে ফেলেছে। দম্‌কা হাওয়া লেগে ঘরখানা কেঁপে উঠছে।

নিজের মানুষটার কথা কখনো মনে হচ্ছে তেন্নির—সেও আবছা। ভয় হচ্ছিল বোয়াল মাছের মতো দাড়ি নিয়ে ভেসে উঠতে পারে ডাহু। আব উঠে যদি তেন্নিকে ছায়েমের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে—হাত-ফসকে পড়ে যাচ্ছিল তেন্নি ছায়েম ধরে নিল।

ভয় অরতিছে? ছায়েম জিজ্ঞেস করল।

কি অরবে? উত্তর দিল তেন্নি।

এ্যাম্‌ভেলায় তো বাচা যাবে না। মাথা নাড়ে ছায়েম, বিলির জল গাঙের জল এক হইছে!

ছায়েমকে সমর্থন করে তেন্নি, তাই যেন্ ঠ্যায়ে!

হুমচা বাতাস বটজিয়ালা পাখির মতো মুখে করে বৃষ্টি নিয়ে আছে। এক টানা সোঁ-সোঁ শব্দ। গাছের ডালপালা অন্ধকারকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে চায়। দিয়াব আলোয় ফালা-ফালা মেঘ দাঁতে দাঁত ঘষে গজরায়।

দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে।

হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে ছায়েম, তুই বস। আমি এট্টু ঘুরে আসি—

ছায়েমের হাত ধরে তেন্নি, কনতে?

আ-লো ছাড়। নছল্লা অরিস নে! ডাফের বাঁশ ধরে ঝুলে পড়ে ছায়েম।

এল্‌লা ফেলায় যাচ্ছ? শব্দ তিনটে তেন্নির গলায় আটকে যায়।

এট্‌টা ব্যবস্থা করে আসি। বাচতি হবি তো! জল ভেঙে উঠোনে নেমে গেল ছায়েম। শব্দ শুনল তেন্নি। ফিরবে তো!

তেন্নির ভাবনাগুলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বাতাসের চাপে ঘর মড়্মড়্ করে উঠছে। হয়তো ছায়েম আসবার আগে তেন্নি এরই নিচে চাপা পড়ে থাকবে। চোখ বুঁজে মটকা ধরে বসে থাকে। ডাহুর সখের ঘর। অনেক দড়ি আর তাতো লেগেছে। তাই এখনো টিঁকে আছে। চাল আলগা হয়ে যায় নি।

বৃষ্টি থেমে গেছে। জোরে বাতাস দিচ্ছে।

এক সময় ছায়েম ফিরল। বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। এসেই ডাকল, তেন্নি—ও তেন্নি নাইমে আয়। ভিয়া আনিছি।

আমি যাবো না।

ক্যা?

কনে যাবো?

তয় কি অরবি?

ভাবতিছি।

গিরামে এট্টাও মানুষ নাই। ফ্যাৎ অরে আয়। ঠিয়ার দেহাস্ পরে।

ছায়েম জানে জল নেমে যাবে। যারা বাঁচবে ফিরে আসবে। তেন্নিকে ফিরিয়ে আনলে গাঁয়ের মানুষ কেড়ে নেবে। ফিরিয়ে দেবে ডাহুকে। তার থেকে এই জলে ভেসে যদি কোথাও গিয়ে ঠেকে—রুইয়ের বিল পেরিয়ে আর কোন ডাঙায়!

মড়মড় করে উঠল বাঁশের খুঁটি। ঘর হেলে পড়ল। তেন্নির হাত ধরে ভেলার উপরে টেনে তুলল। ভারি সোত। ভারি বাতাস।

আল্লা আল্লা। ভিয়া ছেড়ে দিল ছায়েম।

দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল। সোজা দক্ষিণে সদর। জেলা বোর্ডের পথ। তারপর মাঠ। হাল-সাকিন নেই তার।

তেন্নি চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। ঘর বাড়ি বিশেষ

নেই। সব পড়ে গেছে। জলে ভাসছে খড়ের চাল। গরুগুলো নাক উঁচু করে জলের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। মাটির ঠিলে-কলসি চারদিকে জলের উপর চলাফেরা করছে।

দূরে কারা তুজন যেন চালের উপর বসে রয়েছে। গাছের আড়ালে চলে গেল তারা।

সদর রাস্তার কাছে আসতে দেখল তেঁতুল গাছ ধরে এক বুড়ি গরুর জাবের চাড়িতে ভাসছে।

কৗডা?

নবির মুন্সির মা জ্যান্!

ছায়েম তার ভেলা বুড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে চলল, ও বুড়ি? জলের স্রোতে এগোনো গেল না।

ছানি পড়া চোখ তুলে তাকালো বুড়ি, কিডারে মনি।

আমি ছায়েম, তোফাজ্জলের বিটা। ভেসে যেতে-যেতে ছায়েম উত্তর দিল।

ও মনি, আমারে বাচা বাপজান্। দেখ বিটার কাণ্ড! আমারে গরুর চাড়িতি বসায়—বুড়ি কথা শেষ করতে পারে না, আমারে বাচা বাপ।

তুমার ছল গেল কনে? আরো অনেকখানি সরে গেছে ছায়েমের ভেলা।

কি জানি বাপ্। আমারে চাড়িতি বসায় বৌ নিয়ে কোন দিকি যে গেল!

স্রোতের বেগে চাড়ি থরথর করে কাঁপছে। বুড়ি তার সত্তর বছরের জরাতুর হাতে কোন রকমে তেঁতুল গাছ আকড়ে আছে।

চোখের আড়ালে পড়ে গেল বুড়ি। ছায়েম একবার চোখ ফেলল তেন্নির উপর। অন্যদিকে চেয়ে আছে সে।

বাঁকা জলের নিশানা পাওয়া দায়। বে-সামাল স্রোতের গান গাছের গায় লেগে ভেঙে চুরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ছায়েম ভাই। গাছের উপর থেকে কারো হাঁক শোনা গেল।

চারদিকে তাকায় ছায়েম। না, জন-মানুষের কোন সাকিন নেই। বোধ করি মাঠের পাশে কোন দলের ভিতর থেকে মানুষটা তাদের লক্ষ্য করছে।

ও মিয়া কার বিবি নিয়ে পালাচ্ছো?

ও রে সাইজে ভাই—ই—ই—ই—

দূরে সরে গেল ভেলা। মাঠের মধ্যে। লোকজন একটু এড়িয়ে চলতে চায় ছায়েম। মাঠে ভিয়া-ডোঙা-বাঁশের চালির পর মানুষ ভাসছে। একটা ঘরের চালে কুকুর কুঁই-কুঁই করে কাঁদছে।

তুইলে নেব? ছায়েম তাকালো তেন্নির দিকে।

ন্যাও।

কুকুরটাকে ভেলায় তুলে নিল ছায়েম, খুদার জীব তো—বাচে বাচুক—তেন্নির দিকে তাকালো সে, এক গাছা ছোট দড়ি দিয়ে বলল, ভিয়ার সঙ্গে বাইন্দে রাখ। ভাইসে না যায়।

ভেলা এখন কচুবাইড়ের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

যাও কোন ফালি? কুকুরটার গলায় দড়ি দিয়ে ভেলার সঙ্গে বাঁধতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তেন্নি!

যাওয়াডা কি আমার ইচ্ছেয়? হাসে ছায়েম।

আকাশের দিকে তাকালো সে নতুন মেঘ জমছে। ফুঁসে উঠছে মেঘের রাশ। জলের রঙ মিস কালো। বিষ কালো। নলা মাছের মতো লেজের বাড়ি দিচ্ছে ঢেউ।

এ্যমভলায় কদ্দূর যাবানি! সামনের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করে ছায়েম। সামনে আন দত্তর খাল। সুপুরিবনের ভেতর জলের স্রোত পাগলের অসংলগ্ন ইচ্ছের মতো মাথা ঠুকে মরছে। মাটিতে চোড় নামায় ছায়েম। পাঁচ ছ' হাত জল হয়ে গেছে। ওদিকে আর যাওয়া যাবে না।

আমডাঙার বিল আর আনদত্তের খালের জলে কাইজে লেগে গেছে।

যতোদূর দেখা যায় জলের দুরভিসন্ধি এলিয়ে আছে। তলায় নানা স্রোতের চোরাগোপ্তা। কখন কার পাকে গিয়ে পড়ে কে জানে।

ছায়েম ভেলাটাকে মাঠের ভেতর দিয়ে নিয়ে পশ্চিমমুখো পাড়ি দিল। জলে খর-টান। উত্তরে টান। দক্ষিণে টান। চোড় নামিয়ে এগিয়ে যায়। কখনো আকাশে কখনো দিগন্তে চোখ লেপটে থাকে। তবাসে ছায়া। আকাশে। জলে।

ছায়েম ভেলা এনে এড়েন্দার খালের মুখোমুখি গাছপালার ভেতর ঢুকিয়ে দিল। স্রোতের গতিটা হিসেব করে। দক্ষিণ পশ্চিমে টাবরা নন্দখোলের দিক থেকে ঠেলা খেয়ে বিলের জল এড়েন্দার খাল দিয়ে নামছে। উত্তর থেকে নবগঙ্গা, পশ্চিম থেকে শোলগাড়ির বিলের পানি হানা দিচ্ছে। এড়েন্দার খালে জলের তোড় তাই তুখোড়।

মাথা নাড়ে ছায়েম, জল তো কথা কয় না যেন্ খাবঁোতিছে!

কী? উৎকণ্ঠিত তেন্নি ছায়েমের মুখের দিকে তাকায়।

বাচা নাইরে তেন্নি!

ক্যা?

ঠাওর হয় না। যাবো কোন মুহো—বানের পানি কোন ঘুলায় নিয়ে ফেলে কবে কিডা। সব বিটাই তো ঘাড় ফুলোইছে। আকাশের দিকে তাকায় ছায়েম। গতিক সুবিধের না।

বৃষ্টির আগে বাতাস দিচ্ছে। পাতার বিক্ষিপ্ত প্রলাপ ছাড়া আর কোন সাড় নেই। পাখি-পাখালি কোথায় ফেরার হয়ে গেছে। শুধু জলের তলায় ভূখণ্ডের মৃত্যু শিথিল হয়ে আছে।

তে-ন্নি। অকারণে ডাক দিল ছায়েম।

কি ?

কোন উত্তর না দিয়ে এড়েন্দার খালের দিকে চেয়ে রইল ছায়েম। কাল থেকে যে ভাবনাটা তার মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠছিল এতক্ষণে মনে হল তাকে আর বাঁচানো যাবে না। তবে এক সঙ্গে মরার সুখটা কাছাকাছি আছে।

ও তেম্নি কাছে আয়।

বাতাস উঠছে। বাতাসের দমকা এসে লাগছে। কেয়ামতের দিনে কবর থেকে উঠে আসা মানুষগুলোর মতো গাছপালা হল্লা তুলেছে। উথল-পাথাল হয়ে উঠছে বিল্-সাকিনের জল।

কী কও ? তেম্নি জিজ্ঞেস করল। কুকুরটাকে তার বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছে।

যাই কনে। ছায়েম নিজের মনে স্বগতোক্তি করে।

ভেলায় দোলা লাগছে। বাতাসের শব্দ মাটাম আর পোয়া গাছের উপর দিয়ে গজরাতে-গজরাতে ছুটে যাচ্ছে।

মেঘের কেশর ফুলছে। এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে মেঘের রাশ। একটা হলদে আলোর স্বচ্ছতা ক্রমশ অসমীচীন কালো হয়ে যাচ্ছে।

কুকুরটা কুঁই-কুঁই শব্দ করে। তেম্নি তাকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকে। বাতাসের বেগে আরো জোয়ার আসছে। মড়মড় করে উঠছে ডালপালা।

ছায়েমের সঙ্গে তেম্নিও আকাশের দিকে তাকালো।

কালকেউটের গায়ের রঙ পেয়ে জলেরা ঝাপখোলা সাপের মতো কিলবিলিয়ে উঠেছে। এড়েন্দার খাল টান দিয়েছে জলে।

বৃষ্টি নামল। জলের ছাটে তেম্নিকেও দেখা যাচ্ছে না।

বানের জল এক-একবার উতলে উঠছে। বোধহয় কালনাগিনী কালিগঙ্গা বিষ ঢালছে ট্যাবরা-নন্দখোলের বিলে। সেই বিষের চাপ

এসে পড়ছে এড়েন্দার খালের মুখে। গাছপালার মধ্যে জলের ছলনা ডাইনীর হাসির মতো ফেটে পড়ছে।

পোয়া গাছের গোড়া আকড়ে ধরল ছায়েম।

জল এক-একবার পাগল হয়ে ছুটে গিয়ে মাথা কুটে মরছে এড়েন্দার খালে।

শক্ত হয়ে বসিস। তেন্নিকে কথা ছুড়ে দিয়ে পোয়া গাছের গোড়া আরো জোরে আকড়ে ধরে ছায়েম।

মরিয়া হয়ে জল উঠে আসছে কালীগঙ্গা থেকে—ভেলার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। ভেলার মুখটা রয়েছে খোলা; কোন একটা গাছের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিতে পারলে হত। হাত ছেড়ে দিলে ভেলা টেনে নিয়ে যাবে। উপায় নেই। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পোয়া গাছ ধরে থাকে ছায়েম।

রাত হয়ে এসেছে যেন; দানোর মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেঘ।

বৃষ্টির ছাঁটে চোখের সামনে তেন্নি আর কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না।

তেন্নি। সাড়া নিল ছায়েম। ভেসে যায় নি তো!

কি কও? অনেক দূর থেকে যেন তেন্নির গলা ভেসে এল।

পরক্ষণেই উতলে ওঠা জলের চাপ গড়িয়ে এল ভেলার গায়! জলের ঝাপটায় চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাত ছিঁড়ে যাবার মতো হল হত—পারল না সামলাতে—সামাল, চেঁচিয়ে উঠল ছায়েম, সামাল, সা-মা-ল—তে-ন্-নি।

পলকে জলের স্রোত ভেলাটা জঙ্গলের ভেতর থেকে টেনে এনে এড়েন্দার খালের মধ্যে নামিয়ে দিল। তারপই এক টুকরো খড়ের মত ঘুরতে-ঘুরতে ভেসে চলল।

তেন্নি উবু হয়ে কুকুরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ভেলার বাঁশ আকড়ে পড়ে রইল।

গাছে ধাক্কা লেগে জলের আক্রোশ হিঁসিয়ে উঠছে। বৃষ্টিতে কোন কিছু ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু আবছা গাছের ছায়া দু পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে।

এড়েন্দার খাল যেখানে নবগঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সেখানে খালের জল আর নদীর জল মুখোমুখি ফেঁপে-ফুলে ছড়িয়ে পড়ছে।

জলের চাপে কাশীপুরের শ্মশানের বাবলা বন কাঁপছে।

মাথা উঁচু করে দেখল একবার ছায়েম। হিম হয়ে এল তার বুকের রক্ত। সামনে ঘোলার মধ্যে পড়লে এক মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। শুধু নিজের ভাবনাই ভাবতে পারল। চোখ বুজে ভেলা আকড়ে পড়ে রইল সে।

পর মুহূর্তেই কিসে লেগে যেন ভেলা কেঁপে উঠল। উন্মত্ত জলের ঝাপটা দু' হাতের মধ্যে টেনে নিল ভেলাটাকে। দারুণ একটা বেগের ঘূর্ণি অনুভব করল ছায়েম। মনে হল তলিয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে এল। তার লাসটাকে বুঝি কফিনে ভরে দেওয়া হচ্ছে। মাথা তুলতে পারল না। উপর দিয়ে স্রোত ঝাপটা মেরে গেল।

আর একটু দেরি হলে হয়তো ছায়েমের দমবন্ধ হয়ে যেত কিন্তু তার আগে কিসে লেগে আটকে গেল ভেলাটা। ছায়েমের মনে হল বেঁচে আছে বুঝি। চোখটা একটু ফাঁক করে দেখল গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ভেলা। উঠতে চেষ্টা করল। উঠতে পারল না। হাত-পা শিথিল হয়ে গেছে। বুকের ভিতর ওঠা-নামা করছে। খানিকক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে রইল।

হঠাৎ তেন্নির কথা মনে হল। নিজের মনে বলল, ও মাগি ভাইসে গেছে—

পিঠের ওপর বাঁশের পাতা এসে লাগছে।

উঠতে সাহস হয় না ছায়েমের। উঠে দেখতে হবে তেন্নি নেই। কোথায় ভেসে গেছে। বুকটা কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ বুঝি কেমন-একটা শব্দ শুনতে পেল। কান পাতলো। কুঁই-কুঁই করে একটা আওয়াজ বৃষ্টির ছাটের শব্দকে ছাড়িয়ে এল। সাহস করে উঠে পড়ে। দেখে তেম্নি আছে। ইচ্ছে হলে গলা ছেড়ে ডাকে, তেম্নি! গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না। শুধু বুকের ভেতর থেকে দম আটকানো বাতাস সহজে বেরিয়ে এল। না, তেম্নি আছে। কুকুরটাকে জড়িয়ে ভেলা আকড়ে পড়ে আছে।

চারদিকে চোখ ফেলে বুঝে নিতে চাইল কোথায় এসেছে। জায়গাটা সহজে ঠাহর হয় না। অথচ ঠেকে যেন চোরখালি এসে পড়েছে। ওদিক-ওদিক দেখে তাইতো মনে হয়। কী সর্বনাশ! এ যে এড়েন্দার খালের মুখ থেকে একেবারে নবগঙ্গা পেরিয়ে চোরখালির ঝাউগাছের ঘাটের কাছে এসে ঠেকেছে।

ভেলাটাকে আরো গাছপালার ভেতর টেনে নিল। নদীর জল থেকে গ্রামের ভেতর সরে এল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ভেলাটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁপায় ছায়েম। দম নেয়।

স্রোতের হিসেব নেই। কোন দিকের স্রোত যে কোনদিকে যাচ্ছে হিসেব রাখা দায়।

বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকার নেমে এল। কুকুরটা মড়াকান্নার মতো কয়েকবার ডেকে থেমে গেল। সুপুরিগাছে ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ। কুমিরের মতো কাঠের গুঁড়ি সুপুরি বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

এ হেনেই থাকবো নায়ি? ছায়েম তেম্নিকে জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দিল না তেম্নি।

জলের বাঁকাস্রোত দিয়ার আলোয় এক-একবার হিলহিলিয়ে উঠেছে। পচা পাতার গন্ধে ভারি অন্ধকার মেঘ চলাচলের শব্দে কেঁপে উঠছে।

কি করবে বুঝে উঠতে পারে না ছায়েম, কয়দিন এ্যামভেলায় থায়া যাবে! নিজের মনে বিড়বিড় করে। সারাদিন ভিজে শীত

করছে। কোমরের গামছা খুলে ফেলে সে। কুকুরটা মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছে বৃষ্টিতে।

ফিকে হলদে রঙের ঈষৎ অপ্রাকৃত আলো অন্ধকারের মুখে টলটল করছে। সেই আলোর ছায়া পড়েছে তেন্নির মুখে। চুলে। ভিজে শরীরে।

হঠাৎ কুকুরটা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

সজাগ হয়ে বসে ছায়েম, ও তেন্নি জাগে থায়িস—

কিছু দেখেছে! জলের মধ্যে কতরকম জানোয়ারের আনা-গোনা! কামট। কুমীর। ঘোড়েল। সাপখোপ।

কি! তেন্নির গলায় ভয় জবজব করে।

কবে কিডা! ভেলার উপর উপুড় হয়ে জলের দিকে নজর রাখে ছায়েম।

বে-জুত ঠ্যায়ে!

কথা কোসনে।

সুপুরি বনের মধ্যে নানারকম শব্দের আনাগোনা চলছে। অন্ধকারে কারা যেন দল বেঁধে জলের ভেতর দিয়ে চলাফেলা করছে। সেই সব অশরীরীদের দেখা যায় না অথ. নানারকম সংকেতের মধ্যে স্পষ্ট।

ভেলা ছাইড়ে দি?

হ্-অ্। ভয়-ধবা গলার উত্তর দিল তেন্নি।

ভেলা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুপুরিবনের পাশ দিয়ে গ্রামে গিয়ে ঠেকে। নদীর কাছে থাকতে ভয় হয়। কখন টেনে নেবে কে জানে!

কুকুরটা তখনো চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কষ-পাথরের মতো কালো জলের ক্ষুধার্ত মুখে দুর্বোধ্য শব্দের উচ্চারণ। কোথাও আলো নেই। অথচ জলের ওপর ভাঙাচোরা একটা আলোর ছায়া পড়েছে! ওরি

সঙ্গে মিল রেখে কোন গাছের কোঠর থেকে তক্ষক একটানা ডেকে চলেছে, তক্-ক-র্-র্-র্ তক্-ক-র্-র্-র্।

কোন দিকি যাচ্ছি?

কবে কিডা! কার যেন মুখের দিকে চেয়ে ছায়েম উত্তর দেয়।

বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু জলের দোলায় ভেলায় দোলা লাগছে। মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা লেগে ভিজে যাচ্ছে। কারো মুখে কথা নেই। পরিত্যক্ত গ্রাম! জন মানুষের সাড় নেই! নিঃসাড় নিরবয়ব ঘনতা নিয়ে স্থির। বিদ্যুতের আলোয় গাছপালার ভেতরে অন্ধকার এক-একবার নিভে গিয়ে আবার কালো হয়ে জ্বলে উঠছে।

তেন্নি ফিসফিস করল, গাঙ যেন ফুপাতিছে—

তেন্নির কথায় সেদিকে কান পাতে ছায়েম! সত্যি ফোঁপাচ্ছে বাতাসে। ঢেউয়ের ছোবল তুলে হানা দিচ্ছে। বুকের মধ্যে দারুণ ত্রাস টিপটিপ করে। নিঃসাড় জন্তুর মতো সাংরে চলেছে ভেলা।

হিজল আর পোয়া গাছের ফাঁকে যেন অন্ধকার ওৎ পেতে আছে। তেন্নি সেই চুপ করেছে আর কথা বলেনি।

ওর কাছাকাছি কুকুরটা বসে ঘেউ-ঘেউ করে। এই সীমাহীন অনালোকের মধ্যে সেইটুকু যেন প্রাণের স্বরলিপি।

মাথার ওপর কখনো আকাশ দেখা যাচ্ছে। পাতার চিকের আড়ালে সেটুকুও কল্পনা করে নিতে হয়।

অন্ধকারে বসে ছায়েম নিজের ইচ্ছের সঙ্গের আল্লায় ইচ্ছে মিলিয়ে হিসেব করছিল। সেই গূঢ় ইচ্ছার পরিণাম তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কোন ঠিকানা পাচ্ছে না। আজ সকালেও মনের মধ্যে যে সব বাসনা স্থির ছিল বানের জলে কখন ধুয়ে গেছে।

ভেলা অনেকখানি ভেসে এসেছিল। গাছপালার মধ্যে সাকিন ঠিক করতে পারছিল না। কোন গ্রাম। চোরখালি না জয়পুর। জায়গাটা মন্দ নয়। ভেলাটাও একটা কাৎ হয়ে-যাওয়া গাছের গায় ঠেকেছে।

হাত দিয়ে গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে ছায়েম বলে, আম গাছ জ্যান্।

তেন্নি বলল, এহেনে থাকলি হয়।

তা হয়। ছায়েম অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। পাতা থেকে জল ঝরে গায়ের ওপর পড়ছে।

মাজা লাইগে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলে তেন্নি।

গাছের গায় ভেলাটাকে লাগিয়ে দিল ছায়েম। গাছপালাব ঘন ঝোপে জায়গাটাও বেশ নিরাপদ।

নদী থেকে বেশ দূরে। স্রোতের বেগও বেশি নেই। শুধু জলের দোলানিতে ভেলাটা কাঁপছে।

ভিয়া ধরে থায়িস তেন্নি।

দুজনে দুধারে বসে থাকে।

একগাছ দড়ি হলি ভাল হত। অন্ধকাবে ছায়েমের খেদোক্তি শোনা গেল।

ক্যা ?

ভিয়া বাইন্দে থুতি পারতাম।

তেন্নির কোন উত্তর শোনা গেল না। ছায়েম শুধু কুকুটার চোখের দিকে চেয়ে রইল, ক্রুর সংকেতের আলোয় নীল চোখ জোড়া নির্বিকার উজ্জ্বলতায় দপ-দপ করছে।

সারারাত এমনি করে কেটে গেল। সজাগ চোখ নিয়ে বসে রইল ছায়েম। তেন্নিকেও সাবধান করে দিল, চোখ বুজিসনে। শরীল আলগা হয়ে গিলি পানির মধ্যি পড়বি।

অন্ধকারে তেন্নি ঘুমোল কিনা কে জানে; ছায়েম একলা গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল। জড় ভাবনাগুলো মনের চালে কানচেলার মত বুকে ভর দিয়ে আঁকাবাঁকা হাঁটে।

ভোর হবার আগেই হঠাৎ উল্লোঘুল্লো বাতাস সুরু হয়ে গেল। তার সঙ্গে রুয়ের বিলের জল জাওড় দিয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে থাকে। জলের শব্দ গাছপালার ভেতর দিয়ে আড়ংয়ের জীপুতপালার মতো কুচে কল্লামিতে ফেটে পড়ছে।

ছায়েমদের ভেলায় দোলা লাগল। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। নদীর জলে কেমন টান-বেটান। কলকলিয়ে উঠল স্রোত।

ছায়েম সজাগ হয়ে উঠতে-না-উঠতেই ভেলাটা গাছপালার ভেতর থেকে বাঁশপাতা মাছের মত গা ভাসিয়ে বেরিয়ে এল।

তখনো অন্ধকার। নদীর জল স্রোতে আর ঢেউ-এ যেন ফেটে পড়ছে। নদীর ধারে বাঁশঝাড়, পোয়া-সুঁদুরি আর মাটাম গাছের জঙ্গলে একটা অশরীরী আর্তনাদের শব্দ পাতায় পাতায় ছড়িয়ে যায়। পাহিকুলু ত্রস্ত হয়ে চেঁচাতে থাকে।

ছায়েম দু-একটা গাছের ডাল হাতের মধ্যে পেয়েও ধরতে পারল না। সামনেটা ফাঁকা গাছপালা কিছু নেই।

কাছে কোথায় জলেব কান্নার ছলনা নিজেই নিজের পিছনে পাক খেয়ে মরছে। তেম্নির মুখের দিকে তাকালো ছায়েম। নির্বিকার। জানে না সামনে জয়পুরের ঢোন। দুজনকে এক মুহূর্তে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে।

হতাশ চোখে চারদিকে তাকায় ছায়েম। না, ধরবার কিছু নেই। অথচ প্রত্যেক মুহূর্তে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো মাথা নাড়ে ছায়েম। মুখ দিয়ে অসংলগ্ন শব্দ বেরিয়ে আসে।

তেম্নি এতক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝে উঠতে পেরেছে। ছায়েমের ঠোঁটের কাছে একটি শব্দ অসহায় প্রার্থনার মতো উচ্চারিত হল, আল্লা—আল্লা।

সেই মুহূর্তে ভেলাটা স্রোতের পাকে একটা গাছের কাছাকাছি চলে গেল। ছায়েম হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে ঝোলা একটা লতা

টেনে ধরে। ভেলার তলায় জল নড়েচড়ে সরে গেল। থেমে গেল ভেলাটা।

ছায়েমের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ধরেছে। লাল চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে। বুকের হাঁপরটা ওঠানামা করে।

একটু দূরেই আলো-আঁধারির আলোয় নবগঙ্গা।

কুকুরটা এতক্ষণ নিঃশব্দ ছিল এবার তেন্নির কোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচায়।

এ শালার কুউর চুপো। খানিকটা থুথু ফেলে ছায়েম।

চিল্লেস্ ক্যারে? ধমক দেয় তেন্নি।

কুকুরটা তেমনি মুখ উঁচু করে ঘেউ-ঘেউ করে।

ফ্যালায় দে সুমুন্ধি রে!

এরি মধ্যে একটু সলক হয়েছে; গাছপালার ওপর মরা মানুষের মুখের মতো ফ্যাকাসে আলো। ছায়েম চারদিক চেয়ে বাঁচবার মতলব ফাঁদছিল! না, কোন উপায় নেই। হাত ছেড়ে দিলে সোজা নদীতে নামতে হবে, আর নদীতে নামলে—সেটুকু ভাবতে পারে না ছায়েম। আপাতত বাঁচা গেছে। এ যেন মরণের ত্রাস আরো দীর্ঘ করে তোলা। অন্যদিকে তাকায় ছায়েম। কোনদিকেই ধরবার কিছু নেই। পেছনের দিকে ঝোপঝাড় আছে. ওখানে যাবে কি করে। জলে খর টান। তার উপর বাতাস উঠেছে। নদীও মাতলা। বিলের জলের এমনিতেই বুকের কাপড় থাকে না—তারপর বাতাস পেলে তো ঠিয়ারের শেষ নেই!

এবার উপরের দিকে তাকালো। প্রথমে ডালের দিকে—তারপর যে লতাটাকে ধরে পার পেয়েছে। চোখটা লতার ওপর পড়ে থমকে গেল। মিশমিশে কালো একটা লতা; গায়ে পাতার কোন চিহ্ন নেই। মাথাটা একবার ঝেড়ে ভালো করে তাকালো। হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে একটা শীতলতা উঠে হাত-পা ছেয়ে গেল। লতা ভেবে যা ধরেছে সেটা সাপ। জলের ভয়ে ডাল

পেঁচিয়ে ছিল। লেজটা শুধু ঝুলে পড়েছিল। আর তাই ধরে রক্ষে পেয়েছে ছায়েম।

আর-একবার আড়চোখে তাকায় ছায়েম। পিটপিটে কুঁচের মতো চোখ মেলে ছায়েমদের দিকে তাকিয়ে আছে সাপটা। মাঝে মাঝে চেরা লাল জিভ এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে।

ছায়েমের মনে হল শরীরটা অসাড় হয়ে আসছে। এখুনি ঢলে পড়বে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। তেম্নিকেও দেখতে পাচ্ছে না।

জলের টানে ভেলায় টান পড়েছে। কখনো একটা ধার ডুবে যাচ্ছে ভেলাটার। ছায়েমের মনে হচ্ছে হাতটা ছেড়ে দেয়। সাপটাও লেজ দিয়ে হাত পেঁচিয়ে ধরেছে।

ছায়েমের হাল-চাল দেখে তেম্নি একটু অবাক হয়ে গেছিল। কুকুরটাকে চড় মেরে বলল, চুপো দিন মনি। তারপর মুখ তুলে ছায়েমকে জিজ্ঞেস করল, লতা ধরে অমন হামো দিয়ে রলে ক্যান্?

ছায়েমের মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে সাপটা পাক খুলে তাকে ছোবলাতে পারে। হাতের মধ্যে লেজের শীতল অনুভব নড়াচড়া করছে। পাক খাচ্ছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারল তেম্নি কুকুরটা কেন চেঁচাচ্ছে। প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রমশ সাহস ফিরিয়ে আনল; তারপর উঠে ছায়েমের কোমর থেকে দা-টা তুলে একটা কোপ বসিয়ে দিল সাপের গায়। ছায়েমের হাত আছড়ে পড়ল নিচে। ভেলার উপর বসে পড়ে সে। ছাড়া পেয়ে ভেলা ছুটে চলল ঢোনের দিকে—যেখানে জল পাতাল থেকে উঠে পাকে পাকে ঘুরে আবার পাতালে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে।

সাপের লেজটা ছায়েমের হাতে পেঁচিয়ে ছিল—ঝাড়া দিতে আলগা হয়ে খসে গেল।

একটু সময় লাগলো সোজা হয়ে বসতে। উবু হয়ে বসে দুহাত

দিয়ে জল কাটতে থাকে ছায়েম। এতে যদি ভেলার মুখ ঘুরে যায় আর তাতে যদি বাঁচে!

তেঁতুলগাছের অন্ধকারের নিচে ঘোলাজলের আবর্ত ঘুরে ঘুরে পাতালে যাবার পথ না পেতে উতলে উঠেছে। বাঁকের গায়ে সেই জল জরাগ্রস্থ বুড়োর মুখের লোলচামড়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

বৃথা পরিশ্রম হল ছায়েমের, ভেলা নিজের খেয়ালে বয়ে চলল। স্রোত ভেলার গায় লেগে ছুটোপাটি করছে।

জল থেকে হাত তুলে নিল ছায়েম। এই বিশাল জল প্রবাহের ইচ্ছাকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার নেই। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হল।

কুকুরটা জলের দিকে চেয়ে আছে।

তেন্নির দিকে তাকায় ছায়েম। তার ঠোঁট কাঁপছে। দারুণ একটা ত্রাস তার মুখে বলির রেখা এনেছে। অপলক।

মুখ ফিরিয়ে নিল ছায়েম।

মৃত্যু যখন অনিবার্য ভেবে ওরা স্থির হয়ে ছিল সেই মুহূর্তে শুধু একটু স্রোতের ফ্যারে পড়ে ওদের ভেলা সরে গেল তারপর জলের স্রোতই ঠেলে নিয়ে গাছপালার ওপর আছড়ে ফেলল.

হাত বাড়িয়ে একটা জিওল গাছের ডাল টেনে ধরল ছায়েম। জলের স্রোত গাছ পালার ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

একটু স্থির হয়ে দম নিল ছায়েম। তারপর ডালপালা ধরে নদীর ভেতর থেকে উঠে গেল। খানিকটা ভিতরে ঢুকে এসে দম ছাড়ে ছায়েম।

ও তেন্নি—

কি?

কি যেন একটা জিজ্ঞেস করলে গিয়ে থেমে গেল ছায়েম তারপর নিজেই মনে ভাবল, নিহাৎ আল্লার দয়া!

মেঘটা উড়ে যাবার পর এক-একবার রোদ উঠছে। কালকের সেই দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টির পরে আর একবারও বৃষ্টি হয়নি।

আকাশের দিকে তাকালো সে। একটু খুশি হল। মেঘের তা'হলে শেষ আছে! গাছপালার ভেতর দিয়ে ভেলা এগিয়ে যায়। বিলের নিঝেল পানি গাঁয়ের ভেতর এসে ঢুকেছে।

লম্বা একটা আমগুরুজের লতা কেটে নিল ছায়েম। গাছ ধরে আরো খানিকটা এগোয়। তারপর লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে ভেলা বেঁধে হাত-পা ছড়িয়ে বসে।

এখান থেকে গাছপালার ভিতর দিয়ে বিলের অনেকখানি দেখা যায়। আজ কখনো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টির পর বাতাসের মর্মরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

এহেনে মানুষজনের সাড়া পাই নে ক্যা? চোখ তুলে প্রশ্ন করে তেম্নি, এ জায়গাডার নাম কি?

চোরাখালি ও হতি পারে—জয়পুরও হতি পারে।

চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে পাতা করে বিছিয়ে দেয় তেম্নি। ভিজে আছে এখনো।

খিদে লাগিনি তোর?

তেম্নির ঠোঁটে একটু বিষণ্ণ হাসির মতো কিছু দেখা দিল বুঝি।

আমার তো প্যাটে বেদ্না হতিছে।

সেই নির্জন জলে ডোবা এলাকায় নির্জনতা ছলছল করে।

কয়দিন এ্যামভালায় থাকতি হবে কবে কিডা! তেম্নি তার ভিজে কাপড় নিঙড়োয়।

উঃ, গন্ধ পাচ্ছিস?

মাথা নাড়ে তেম্নি!

মানুষ ভাইসে আইসে গাছে লাগিছে বুঝি!

রোদ দেখা দিলেই দুজনে আকাশের দিকে তাকায়। কখনো পরিচিত বাতাস এসে গাছপালার আলস্য ভেঙে দিচ্ছে।

আর যদি বৃষ্টি না-হয় কাইল তামাৎ জল কুমে যাবে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকে ছায়েম। পুব হাওয়ায় কখনো দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

টেঁয়া যাচ্ছে না আর। নাকে কাপড় দিল তেম্নি।

হ'। ছায়েম ভেলা খুলে ভাসিয়ে দিল আবার।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ভেলা টেনে নিয়ে যাওয়া মুসকিল। ঘন গাছের মাঝে ভেলা আটকে যায়। তবু ছায়েম অনেকদূর সরিয়ে নিয়ে গেল।

শুকনো ডাঙার জন্যি পিরানডা ক্যামন অরতিছে। সমর্থনের জন্যে তেম্নির চোখের দিকে তাকালো ছায়েম।

গাছপালার ভেতর দিয়ে ওদের গায় রৌদ্র এসে লাগছে। বর্ষার স্বচ্ছ দিন! কদাচিৎ মেঘ দেখা যায়।

একটু দূরে বড় একটা গাছে ভেলা বাঁধল।

ম্যাঘ বোধহয় কাইটে গেল।

ঠ্যায়ে তাই, ছায়েমের মুখে হাসি, আর দুডো দিন কাটাতি পারলি হয়। ভিয়ার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ছায়েম।

চারপাশে কোন সাড়া-শব্দ নেই।

চোখের উপর রৌদ্র পড়ে তাই একপাশে কাত হয়ে জল কেটে ভেলা সরিয়ে নিল। কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউ-ঘেউ করছে।

চ্যাচাস ক্যা? তেম্নি তার গায় হাত রাখে।

ছায়েম কাৎ হয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে বলে, কি রে শালা আবার কিছু দেখলি নায়ি?

অশল্যে কয়ে না। তেম্নি ছায়েমকে ধমক দে

কুকুরটা গরগর করে।

তোরে নিয়ে ঘর বান্দবো। ছায়েম গুনগুন করে, অনেক-দিনকার সাধ আল্লা মিটোয় দেছে।

মাথা নিচু করে থাকে তেম্নি। কি ভাবে সেই জানে।

এ গেরদে থাকবো না। বিলির পানি পার হয়ে দূরির পথ চলে যাবো। তুই যদি থায়িস তেন্নি—

কুকুরটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে গরগর আওয়াজ করে।

শালা কিছু দেহিছে বোধ হয়।

হয় গন্ধ পাইছে ঠ্যায়ে।

দুজনেই সন্দেহের দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। নিঃসাড় বনভূমি উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝিমঝিম করছে। কখনো পাখির পাখার শব্দ। কখনো পাতার ফিস ফিস।

না, শালার কুউর বড়ো কাউতাল বাধালো। হাত তুলে মারার ভঙ্গী করে ছায়েম আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে রইল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাক তেন্নি।

প্যাট মুচড়াচ্ছে। স্বগতোক্তি করে ছায়েম। সন্ধ্যে নাগাদ জঙ্গলের মধ্যির থে বাইরোবো। খুন-পড়া রোদ পড়িছে। এয়ে ঘাপানে পানি নাইমে যাবে। তেন্নি বেড়ালের মতো মুখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে।

দূরে কোথায় যেন গাছপালার মধ্যে শব্দ হতে থাকে। সেই দিকে কান খাড়া করে দুজনে। জীবজন্তু হতে পারে। মানুষও হাতে পারে। কেউ হয়তো গাছপালার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল দুজনে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দুপুর একটু গড়াতেই ছায়েম বলল, খিদেতে তো বাঁচিনে। চল দেহি ঘুরেঘারে—

গাছের ভিতর দিয়ে ভেলাটাকে পুবের দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। ইচ্ছে জয়পুর গ্রামের মধ্যে ঢোকে।

হাত দিয়ে জল কাটতে-কাটতে ছায়েম হঠাৎ খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে, ও তেন্নি গ্যাখ-দ্যাখ্—

কি? তেন্নি অবাক হয়ে মুখ ফেরায়।

ভালো অরে ছ্যাখ্ দিন! গাছের গুঁড়ির দিকে আঙ্গুল দেখায় ছায়েম, দেখতিছিস ?

তেন্নি বুঝতে পারে না। ছায়েমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দেহিছিস কতোহানি পানি নামিছে। সয়ালে ছেল এতহানি—এই দেখ তার দাগ। জল কুমতিছে। আমরা বাইচে গিলাম। খুসিতে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে ছায়েম, তোর নিয়ে ঘর বান্ধ্বোই। তারপর নিজের মনে গুনগুন করে, আগুা বেইচে করবো বিয়া মনে বড়ো সাধ! আরে-ও-ও-ও-ও মিয়া—

কখনো গলা চড়ায়। কখনো নামায়।

দু'হাতে জল কেটে সামনে এগিয়ে যায় ছায়েম। মুখে গানের বিরাম নেই। জল নেমে যাচ্ছে। আবার মাটি জাগবে। মানুষেরা বাড়ি ফিরবে। ঘর তুলবে। কাঁধে হাল-নাঙল নেবে। সুখ-দুঃখের প্রবহ ভাটিয়ালির মতো উজানে বইবে। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে ক্ষিধে-যন্ত্রনার কথা বোধ হয় ভুলে গেছিল। খানিকটা গিয়ে থামতে হল। তেন্নি তাকে থামালো।

মান্ষির গলা শুনা যায় না!

কান খাড়া করে ছায়েম। কুকুরটাও মুখ উঁচু করে চেঁচাতে থাকে।

কিডা ? ছায়েম ফিসফিস করে।

কুকুরটা আরো জোরে চেঁচায়।

এ শালা চেঁচাস ক্যা ? ছায়েম ধমক দেয়, আবার কেউটে দেখলি নাযি ?

ও ভাই—ই-ই-ই। একটা আর্তনাদ ভেসে এল।

ছায়েম আর তেন্নি দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়।

কিডা ?

মানুষ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার সেই আর্তনাদ জলের উপর দিয়ে হেঁটে এল, ও ভাই আমারে বাচাও—ও—ও।

সাড়া দিল ছায়েম, কোনদিকি ?

কুকুরটা সামনে চেঁচিয়ে চলেছে। তার চীৎকারে ভালো করে কথা বোঝা যায় না।

আর এট্টু আগোয় ডানির দিক আসো।

তেন্নি কাপড়-চোপড় ঠিক করে কুকুরটাকে কাছে টেনে নেয়।

অনেকটা এগিয়ে যেতে হল। গাছের ওপর থেকে লোকটা নেমে এল। আর এট্টু আগোও—

আরে লোকটা আর কেউ না তেন্নির খসম ডাহু!

এঃ শালা, আফশোষে ঠোঁট কামড়ায় ছায়েম, মরিছিরে মাইর-চাচা—অস্ফুটশব্দ করল।

ডালের ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে ভেলার ওপর নামলো ডাহু। লাফ দিয়েই নামল। আর সামলাতে না পেরে জলে মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল ছায়েম। কোন রকমে সামলে নিল।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না ছায়েম। গলায় আটকে গেল। তারপর হলদে ছোপ-ধরা দাঁত বের করে হাসলো, মিয়াভাই নায়ি ?

ডাহুর চোখ এতক্ষণ তেন্নির ওপর ছিল। ছায়েমের কথায় মুখ ফিরিয়ে ছায়েমকে দেখল।

কুকুরটা তেন্নির কোলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ডাহুর গা শুঁকে গরগর শব্দ করে।

ছায়েম মনে-মনে কোন গুরুতর পরিণতি আশা করেছিল। কুছুটে মানুষ ডাহু। রাগের মারি কিছু-একটা করে ফেলতে পারে।

ভেলার পর তিনজন স্থির হয়ে তিন জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুধু কুকুরটা একই স্বরগ্রামে গরগর করে যাচ্ছে।

কিছু একটা হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু তার আগে ডাহু ছায়েমের দিকে ফিরলো। ফিরে হাসলো। হেসে বললো, আল্লা তুমার হাত দিয়ে আমারে বাচালো। হাতখান দাও দিনি—নিজেই ছায়েমের হাত টেনে নিয়ে বুকে ঠেকালো, ভাইরে জীবনডা যে কেমন মরতি না বসলি বুঝা যায় না।

এতক্ষণে সহজ হল ছায়েম, তুমার সমাচারডা কি?

মাথা নাড়ে ডাহু, মাইরে আনিছিলাম পিরায়—মধুমতী উজোয় ভাটিতি সুজাসুজি মরগাঙের মধ্যি দে ছাতড়ার খাল ধরিছিলাম। আর এট্টু আগোলি রুইয়ের বিল। তুমচা বাতাসে নাও গেল উলটে। মানুষগুলো যে কোন সাকিন হল কবে কিডা। আমি তো কোন রহমে ভাইসে-ভুসে এহেনে উঠিছি।

ভেলাটা কাঁপছে। তেন্নি আর ছায়েম দুজনে ডাহুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাপার অরতি গিছিলে শুনলাম?

হ' চালানি কাজে।

লোকসান হইনি তো?

লোকসান! হাসল ডাহু, খাটনির ট্যায়া না! তয় আমার বিবির লোকসান হইছে। তেন্নির দিকে তাকালো, এ কহান সাড়ি কিনিছিলাম বিবির জন্যি ভারি খাপসুরৎ সেই :হনই গেছে—সেইডেই বড়ো লোকসান রে মিয়া!

ডাহুর এ কথার কোন উত্তর দিল না ছায়েম। ভালো দেখায় না।

বিবিরে পাইলে কনতে?

বে-ভুস হয়ে খালাসিগে ভিটেয় গাঁবগাছের সাথে বাইধে ছেল। টাইনে তুললাম। জানি নাকি কেডা! শ্যাষে ভিয়ায় তুলে মুহির চুল সরায় দেহি! নিজেকে অপরাধী মনে হল ছায়েমের।

মিয়াভাই। একটু থামে ডাহু, কিছু বলবার আগে ভেবে নিতে

চায়। কুকুরটা তখনো তেন্নির কোলের মধ্যে বসে গরগর করে।

কুকুরকেই কথাটা বলে ডাহু, চুপোরে বাপু, দুজনের মুখে দিকে তাকিয়ে ডাহু হাসে, মানুষ দুডেরে জিগ্যেস কর চিনাশুনা আমি—তারপর ছায়েমের দিকে ফিরে বলে, তুমি যা করলে মিয়া খুদাই, জানলো। আর আমি জানলাম। অনেক ক্ষেতি করিছি তুমার। শেষের দিকে ডাহুর গলা ধরে এল। ফিরে নিতি চাও ন্যাও।

থাক্ থাক্ মিয়াভাই—ছায়েম একবার তেন্নির দিকে আলগোছে দেখে নিল! তারপর বলল, কি করা যায় কও দিন ?

কি কথিছ তুমি ?

কথিছি এ্যান্নে যাবা কনে ? গাছগাছালির মধ্যি থাকবা না বিলি যাবা ?

এহেনেই থায়ো ভাই ; যাবো কোন ফালি—বৃষ্টি গেছে—পানি যাক। তারপর তো! বিলির পানি খলবলায় নামতিছে। পড়লি আর রইক্ষে নাই!

ছায়েম ভেলার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে চোখেমুখে জল দিল, চামড়া টান টান হয়ে গেছে, জ্বালা অরতিছে চোহি!

তেন্নি সেই থেকে চুপ করে গেছে আর কথা বলেনি।

বিকেলের দিকে আকাশে অল্প-সল্প মেঘ দেখা দিল।

আকাশের দিকে তাকালো ছায়েম, এ মেঘে ডর নাই। মিয়াভাই ইবার বোহহয় বাইচে গিলাম!

এত সহজে। অবাক হয় ডাহু, ডাঙায় না উঠলি বিশ্বাস নাই!

সন্ধ্যের আগে মানুষের হল্লার শব্দ পাওয়া গেল। খুব কাছে নয়। একটু দূরেই হবে বোধকরি! বিলের বাতাস বয়ে শব্দটা উঠে এল। কান খাড়া করে তিনজনে। ডাহু আর ছায়েম দুজনে

উঠে গলা বাড়িয়ে বিলের দিকে তাকায়। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বোঝা যায় না।

আর-একবার শব্দটা আকাশে উঠে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।

ডাহুই কথাটা বলল, গাছের মাথায় চড়লি ব্যাপারডা বুঝা যাতো—

হুঁ। সায় দিল ছায়েম।

সরকারি নৌকো ভিড়িছে বোধহয়; মানুষ তুলে নিবার জন্যি—

জানলে ক্যামভালায়!

ভাইটে পাড়ার থে শুনিছিলাম। মনে নয় কাছেই—

হয়-হয়। সায় দেয় ছায়েম।

কাছাকাছি হলে আগোয় ধরতাম। উসখুস করে ডাহু।

দেখবো নায়ি গাছে উঠে? নিজেই প্রস্তাব করে ছায়েম।

মাথা নাড়ে ডাহু, যদি নসিবি থায়ে ডাঙাও পাতাম—এক ওক্ত নাস্তাও হত। সামনের গাছটাতে উঠতে যাচ্ছিল ছায়েম। ডাহু বাধা দিয়ে বললো, বড়ো গাছ দেহে ওঠো মিয়াভাই। অনেক দূর তামাৎ দেহা যাবে—

কোমরে কাটারি গুজে শাড়কেলের মতো গাছে উঠে গেল ছায়েম। জলের তলা থেকে তখন অন্ধকার ভেসে উঠেছে। তার ছায়া গাছপালার আনাচে-কানাচে ঘন হয়ে উঠেছে।

ছায়েম গাছে ওঠবার পর অন্যমনস্ক ভাবে ভেলাটা সরিয়ে নিল ডাহু। একটু-একটু করে সরে গেল খানিকটা।

মিয়াভাই। গাছের ওপর থেকে ডাক ছাড়ে ছায়েম, ও মিয়াভাই।

ডাহুর সাড়া পওয়া গেলনা।

যে সন্দেহ ছায়েমের মনে উঁকি দিয়েছিল সেইটাই সত্য হয়ে দেখা দিল। গাছের মাথা থেকে তাড়াতাড়ি জলের কাছে নেমে এল।

কোথায় ভেলা!

অন্ধকার তখন গাছপালার গায় একাকার হয়ে গেছে। মৃত্যুছায়া ঘন হয়ে উঠল তার চোখে।

মিয়াভাই-ই-ই-ই-ই—। ছায়েমের আর্তনাদ শরীরী হয়ে চারদিকে ছুটে ফিরলো, মিয়াভাই তুয়াই তুমার আমায় ফেলায় যায়ে না। মিয়াভাই—ও মিয়াভাই-ই-ই-ই।

কাছাকাছি গাছপালার মধ্যে স্থির বসেছিল ডাহু। জড়ের মতো তেম্নিও স্থির। গাছপালা অন্ধকার-আকাশ জল ঝিঁঝিঁ কারো সাড় নেই।

শুধু সেই ধোঁয়া-ধোঁয়া অন্ধকারে ছায়েমের গলার কান্না ভেঙে চুরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

পরিচিত মানুষটার অনুপস্থিতি ও তার গলার আওয়াজ কুকুরটাকে বিভ্রান্ত করছিল। ছায়েমের আওয়াজে মুখ তুলে কান খাড়া করে লেজ নেড়ে সেই পরিচয়কে সমর্থন করছিল। আর চাপা ডাকে সাড়া দিচ্ছিল।

জল যেখানে মৃত্যু আর নৃশংস যন্ত্রণা নিয়ে ওৎ পেতে আছে সেখানে ছায়েমের বিভ্রান্ত চেতনা ক্ষেপার্ধ আবেগে শুধু একটাই শব্দকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল, মিয়াভাই—ই-ই-ই—

মানুষডারে ফেলায় আসে না। কান্নায় তেম্নির গলার স্বর সবটুকুও বোঝা গেল না।

চুপো। দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল ডাহু। বড়ো পুড়ে যাচ্ছে তোর না?

মিয়াভাই। ছায়েমের আর্তনাদ এসে আছড়ে পড়ে, ফেলায় যাইয়ে না—

কুকুরটাই ঘেউ ঘেউ করে অন্ধকারে গলা বাড়িয়ে বিলম্বিত লয়ে ব্যর্থ আশ্বাস দিল।

ক্রমশঃ অন্ধকারের তলায় চাপা পড়ে গেল সব।

শুধু কুকুরটার অসংলগ্ন চিৎকারের অস্তিত্বকে আশ্রয় করে ছায়েম

নেশাগ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছিল। রাত আরো গভীর হল। ভেলা দূরে সরে এসেছে। ছায়েমের আর্তনাদ আবছা শোনা যাচ্ছে। ডাহু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তেম্নির দিকে তাকালো, দুঃখু হচ্ছে নায়ি তোর ?

তেম্নি উত্তর দেয় না। শুধু কুকুরটাকে আরো জোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

কথা কথি পরান ফাটতিছে বুঝি !

অন্ধকারে চোখ ফিরিয়ে নিল তেম্নি। অন্ধকারে চোখ দেখা যায় না। চোখের জলও না।

চল্ একবার তোরে বাড়ি নিয়ে যাই—ঢেকি দে কুটে থ্যাথ্লায় থোব—

গাছপালার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গাছের ওপর কখনো কানাকুয়ো কি প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে।

ভাবিছিলি ভাইটে পাড়ার ঢোনে বুড়ো মরিছে! বুয়াল মাছ চোখ দুটো খাবলায় খাচ্ছে—চোহি আর দেখতি পাবে না!

কখনো গাছের অকারণ পাতার শব্দ কুকুরটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আর সেই শব্দকে আশ্রয় করে ছায়েমের আর্তনাদ বাতাসে ভর করে এক-একবার ভেলার উপর হানা দিয়ে যাচ্ছে।

শালা ওহেনে শুয়োয় মরবে। হাত-পা পচেগলে খসে খসে পড়বে। শিয়েল-শগুনি ছিড়ে খাবে। অন্ধকারে চকচক করে ডাহুর মুখ।

তেম্নি ঠিক তেমনি করেই বসে থাকে। তার ভাবনা হয়তো উলটো পথ ধরে চলেছে।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় যে ভাবনার বিরুদ্ধে লড়েছিল এখন তাকে তারই সামিল হতে হচ্ছে।

তখনো অনেক দূর থেকে ছায়েমের কান্নার ছায়া ভেসে আসছিল। চারদিকের জলের নিঃসীম অস্তিত্বের মাঝখানে একটি

মানুষ মৃত্যুচেতনায় জীবনের প্রত্যাশাকে আরো অধীর আগ্রহে বাঁচিয়ে রাখছিল।

অনেক রাতে ভেলাটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিলের ভেতর এসে পড়ল। এতক্ষণে ডাহু তার খাবরোনি বন্ধ করেছে। একটু ঝিমিয়েও পড়ছে বুঝি।

বিলের কোন দিকে যাবে ঠিক করে উঠতে পারে না। অথচ জানে আশপাশে কোথায় রুয়ের বিলের জল মরগাঙ দিয়ে আছড়ে-পিছড়ে নামছে। সেই ঠিকানা কোথায় কোন অন্ধকারে ডুবে আছে তাকে ঠাওর করা দায়।

ভেলাটা বিলের মধ্যে ভাসতে লাগলো। এতক্ষণ দুহাতে জল কেটে ভেলাটা এদিক ওদিক চালাচ্ছিল ডাহু। শেষে ভোর হবার প্রত্যাশায় হাত গুটিয়ে নিল।

মৃতপ্রায় তেন্নি দুর্বহ একটা লাঞ্ছনার প্রতীক্ষায় থেকে নিজের চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল!

বিকেলের ছেড়াখোঁড়া মেঘ ভোর রাতে নারাণদে-বিষ্ণুপুরো থেকে জমাট বেঁধে দিগন্তে উঠে এল। বাতাসে তার আভাস পাওয়া গেল।

ইঃ, ম্যাঘ জেন্ কুসুমদের পীরির মুরির নাগাল্—আল্লা—আল্লা। ফিসফিস করল ডাহু।

যে শান্তবিল এতক্ষণ মাজিল পাথরের খুরোর মতো স্থির হয়ে পড়েছিল একটু করে সাড়া পাওয়া গেল তার। হঠাৎ সেই বিপর্যস্ত শান্তির উল্লাসে হিংস্র জলের অবয়বে বিষকূট নাগিনীর ক্রোধ সোচ্চার হয়ে উঠল। বাঁকা স্রোতের তরল হেঁয়ালি দুর্বোধ্য সংলাপের যথেচ্ছাচারে ফেনিল হয়ে উঠল।

চারদিকের অভিভূত অন্ধকারে মেঘ আর জলের অসমীচীন যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে গেল ডাহু। এমনিতে ভয়-তরাসে মানুষ সে।

বাতাস উঠতেই ভেলা জলের সঙ্গে গা-মিলিয়ে চলতে শুরু করেছিল। কোনদিকে যাচ্ছে সে সব লক্ষ্য করবার মতো স্থিরতা ডাহুর ছিল না। ভোরের একটুখানি আলোর সন্দেহ মেঘের ফাঁকে ঈষৎ তামাটে ধূসর হয়ে উঠেছিল।

এ কনে আলাম! ডাহু চারদিকে তাকিয়ে দেখে। জলের ওপরে তখনো অন্ধকার কাটেনি। মোল্লার দাড়ির মতো সকালের মুখে তখনো অন্ধকার ঝুলে আছে।

দিক সাকিন করতে না পেরে সামনের দিকে চেয়ে বসে ছিল ডাহু। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ইয়ে-এ-এ-এ-এ—আল্লা।

অন্ধকারে বুঝতে পারে নি। এখন দেখে সামনে পোয়া আর হিজলের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বিলের জল গজরাতে গজরাতে ফেনা ছিটিয়ে মরগাঙের বুকে নামছে। ছহাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল ডাহু। চোখ ছুটো বেরিয়ে আসতে চায়।

জলকল্লোলের বিশৃঙ্খল আয়োজনের মধ্যে উত্তেজিত মৃত্যু!

আল্লা—আ—আ—আ—। ডাহুর বুকের সমস্ত আতঙ্ক যেন ওই একটি শব্দের স্বরগ্রামে বেজে উঠল।

ভয় পেয়ে কুকুরটাও চেঁচিয়ে উঠল।

শুধু তেন্নির কোন চঞ্চলতা ছিল না। জীবন-মৃত্যু, দুই তার কাছে সমান। ভেলা অনিবার্য স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ডাহু যেন পাগল হয়ে গেল, বাঁচাও আমারে বাঁচাও—ও ও-ও-ও।

একটা ভৌতিক শব্দ প্রবাহ তার গলার মধ্যে ঘর্ঘর করে উঠল। বিলের নিঝোল পানি মরগাঙের ঘোলায় মিশে একাকার হয়ে গেল।

সকালে সূর্য উঠল।

ভেলাটাকে দেখা গেল দিঘেলের চরের ভাঁটিতে মাঠের মধ্যে

ভাসছে। ভিজে কুকুরটা ভেলার উপর বসে জলের দিকে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্গ।

বোধহয় সেই বিমূঢ় জীবপ্রকৃতি গত কয়েকদিন ভেলার ওপর জীবনের যে অভিনয় হয়ে গেল তার কথাই ভাবছিল।



মহানন্দ মালীর গল্প

মধ্য কোলকাতার একটা ঘিঞ্জি এলাকার পার্ক, ঠিক পার্ক নয় —পার্কের মত এক টুকরো জমি থেকে বদলি হয়ে এল মহানন্দ। মিড্‌ল রোডের পুরোন পার্কটায়। চার পাশের বাড়িঘরের মাঝখানে অনেকখানি আকাশ ধরা পড়েছে। জানালা খুলে দিলে চোখে পড়ে পুবের আকাশ আর কোয়াটারের কপাট সরিয়ে নিলে পশ্চিম দিগন্তের অনেকখানি নেমে আসে।

পার্কে ফুলের সমারোহ নেই। রাস্তার পাশ দিয়ে মেহেদি গাছের ছাঁটা বেড়া। মাঝখানে প্রাচীন শিমূল-আমলকি গাছ। নতুন লাগানো ছাতিম আর মেহগ্নি ডালের আগায় পাতার চকমকি জ্বলছে। পার্কটাকে দেখে মনে হয় ঘাসে ঢাকা এক টুকরো

আদিম জমি। সহরের প্রয়োজনের পরিধি থেকে কোন রকমে বেঁচে আছে।

কারণও ছিল। ক্রমে নগরপরিকল্পকদের হিসেবে নষ্ট করে দেবার জন্য পার্কটা নির্দিষ্ট ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরেই। একদিন পরিকল্পনা পালটালো। পার্কটা বেঁচে গেল। এবং বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে রইল। ছেলেদের খেলার আর বৃদ্ধদের বায়ুসেবনের অতিরিক্ত কোন প্রয়োজন পেল না।

অবশেষে স্থানীয় নগরপিতা পার্কটাকে অহল্যাত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারলেন। পৌরসভায় পার্কের জন্য বরাদ্দ হল অর্থ, ঋতুর জন্য ফুলের আয়োজন আর পারিপাট্যের জন্য পরিকল্পনা।

মাঝখানে একটা ফোয়ারা হল। ফোয়ারার মাথায় ডানা মেলা পরি। লাল সুরকির নতুন পথ চারদিক থেকে ফোয়ারার গায় এসে ঠেকল। জলে কহ্লার পোতা হল। রঙ-বেরঙের মাছ ছাড়া হল। ভিক্টোরিয় প্যাটার্ণের গ্যাসের আলোও ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

ক্রমশ মাঠের চারপাশে মাধবীর জনপদ ঘন হয়ে ওঠে। চৈত্রের মায়াবতী মেঘদের ছায়ার ভারে নত হয়ে এল মঞ্জরিত ডাল। একটা অপরূপ উৎসের দিকে উৎসারিত হল মাঠের প্রাণ। এমন সময় পুরোন মালীকে বদলি দিয়ে মহানন্দ এল। নগরপিতা বোধ হয় পার্কটির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই পুরোনকে বদলে নতুন এল। মহানন্দ নগরপিতার সঙ্গে এরি মধ্যে বারকয়েক দেখা করেছে। আভূমিনত হয়ে নমস্কার জানিয়েছে। পরামর্শ প্রার্থনা করেছে।

নগরপিতা বয়সের কোঠায় ষাট ছাড়িয়ে গেছেন। রসুনের রঙ ধরেছে তাঁর দাড়িতে। নিজে জমানো-প্র্যাকটিস চিকিৎসক হলেও এককালে ফুল, ফুলের বীজ, গাছপালা ও বিচিত্র পশুপাখির সখ ছিল। যৌবন-কালে, বিভিন্ন ঋতুপর্বে কোলকাতায় যে সব পাখিরা আসত তাদের খোঁজ রাখতেন। রাঙামুড়ি ও সিল্লিহাঁসের পার্থক্য

জানতেন। অর্কিড ও ক্যাক্‌ট্যাস নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।

পৌরসভায় নির্বাচিত হয়ে গার্ডেন কমিটিতে গেলেন। লোকের ভিড় নেই। কাজের অবকাশ আছে।

নগরপিতা বললেন, মহানন্দ মাঠখানাকে ভালো করে সাজাও—দেখো কারো যেন পিছনে পড়ে থাকতে না হয়।

একগাল হেসে মহানন্দ জবাব দিল, সে আপনার ইচ্ছেয় পারবো হুজুর।

পিঠ চাপড়ে দিলেন নগরপিতা।

বৃষ্টির ঋতু মাঠে ঝিলমিল নামিয়ে দিল। খুসি হয়ে আকাশের দিকে তাকায় মহানন্দ। কখনো লবঙ্গ ফুলের লতায় ছাওয়া ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়! গভীর স্নেহ আর মায়াবী মমতা দিয়ে চোখের উপকূল থেকে মাঠের অদূর সীমানা পর্যন্ত ছুঁয়ে আসে। লোক নেই। শুধু একদল পাগল হাওয়ার খেয়াল রক্তকরবীর ডালপালায় খেলা করে ফেরে।

বর্ষার শেষে কাজ পড়ে গেল মহানন্দর। সকালে মাটি তৈরী করে। চারকোণা, তিনকোণা, বৃত্তাকার, চন্দ্রকলার মত পরি ত মাটিকে ফুরফুরে করে। ফুসফুসে করে। গুঁড়োগুড়ো করে ফেলে। হাওয়ায় উড়িয়ে দেখে। কত বর্ষার বৃষ্টি খেয়ে রঙ ধরেছে। আধহাত পর্যন্ত গভীর করে মাটি কাটে। নিচের মাটি উপরে তোলে, উপরের মাটি নিচে নামায়। ডেলা-ডেলা মাটি ভেঙে নরম করে দেয়। বীজের পাতারা হাত মেলবে। কষ্ট না-হয় যেন! মাটির মিষ্টি আর সোঁদা গন্ধ মহানন্দের গায় লাগে। গভীর শান্তি পায়। নিবিড় সুখ!

এক বন্ধ্যামাঠে তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। প্রাণ ছিল না সে মাঠের।

কোনদিন সন্ধ্যের দিকে একটু রাত করে নগরপিতা মাঠে

আসেন। ঘুরে ঘুরে দেখেন। ঘুরিয়ে দেখায় মহানন্দ। নগরপিতা মাটি হাতে নিয়ে অনুভব করেন। বলেন, বাঃ বেশ হয়েছে। এইবার বীজ বসাও।

হাঁ হুজুর, সময় এসে গেছে।

বেছে জুৎসই বীজ ছড়াও। না-জানা থাকে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো। আমারও কিছু জানা আছে।

সে তো নিশ্চয়। তবে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি।

উত্তরের বড় দেওয়াল ঢেকে দিও। ফিরে দাঁড়ালেন নগরপিতা।

আমিও তাই ভেবেছি। হলিকক দেব ভাবছি। নতুন হলদে দেওয়ালের গায়—

মহানন্দকে শেষ করতে দেন না নাগরপিতা। বললেন, বাঃ বাঃ চমৎকার মানাবে! হলদে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভালো জমবে। মাথা নাড়েন তিনি। স্বল্প দীর্ঘ দাড়িতে হাত বোলান। মৃদু হেসে মাথা নোয়ায় মহানন্দ।

আর ফোয়ারার ধার দিয়ে ব্লাকগোল্ড ডালিয়া ঘুরিয়ে দেব! ওদের মাঝখানে দেব ছোট দ্বীপ করে মেঠো-রু কি পাহাড়ি সোরেলের চারা। ছোট আর ভারি মিষ্টি। ফুলতো নয় যেন ডালের আগায় রঙের ছিটে।

মাথা নাড়েন নগরপিতা সমজদারের খুসিতে। বলেন, তোমার তো বেশ এলেম আছে।

মাঠের চারকোণে, থেমে যায় মহানন্দ। একটু বুঝি ইতস্তত করে।

বলো-বল। উৎসাহ জোগান নগরপিতা।

ভাবছি কশমশের মেলা বসাবো।

খাশা হবে। নগরপিতার ঠোঁটে পাকাহাসি ঝিলমিল করে; রুপোলি দাঁড়িতেও বুঝি সেই আভা লাগে।—কশমস আমার বড্ড ভাল লাগে। ওদের দেখলে নতুন-খুশিতে-ভরা মেয়েদের কথা

মনে হয়। মাথা নিচু করে কিছু ভাবেন নগরপিতা। তারপর মুখ তুলে বলেন, সুগন্ধিও কিছু লাগিও—এদের তো শুধু রঙের বাহার গন্ধ নেই, কি বলো?

আজ্ঞে সে যদি বলেন তো এলিসাম্ সেঞ্চুরিয়া, ইম্পেরিয়ালিস্ মিগ্‌নুনেটি ছড়িয়ে দেব। গন্ধে ভরে উঠবে মাঠ।

হ্যাঁ, তোমাকে একটা খবর দি। নগরপিতা অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, কয়েকটা ময়ূরের ব্যবস্থা হয়েছে। তোফা খুলবে কি বল? নগরপিতার চোখে স্বপ্ন।

এই শীতেই দেখবেন মাঠে কেমন মরশুমি বাহার আসে।

তুমি তো কাজকর্ম বেশ জান দেখছি, শিখেছ কোথায়?

আজ্ঞে ব্যারাকপুরের এক কাগজের কলের সাহেবের কাছে। বিলিতি সাহেব। ফুলের নামধাম আর চাষের কানুন তিনিই শেখান।

ভাল হয়েছে তোমাকে পেয়ে। আমার বড় ইচ্ছে মরা মাঠটা বাঁচুক। নগরপিতা মাঠের দিকে চোখ রাখলেন, মাঠটাকে বাঁচানো চাই। তারপর নিজের মনে বলে চলেন, ছোটবেলা থেকে দেখছি রঙ নেই রূপ নেই ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটুকরো পতিত জমি। কেউ এর সামর্থ পরখ করেনি।

কার্ডিনাল ক্লাইম্বারের নতুন পাতা বেড়াকে ঢেকে ফেলেছে। মুকুল দেখা দিয়েছে। ফুল আসবে।

বাড়ির বারান্দায় বসে মাঠের দিকে চেয়ে থাকে মহানন্দ। দুপুরে লোক থাকে না। চড়াইয়ের ভিড় হয়। দুটি-একটি শালিক নামে। ঘাসের নরম পাতার মধ্যে হাঁটাচলা করে। শস্যের খোঁজ নেয়।

দুপুর গড়িয়ে এলে ছেলেরা মাঠে এসে যায়। পাখিদের তখন ছুটি। সারা মাঠে ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি। দৌড়োদৌড়ি। খেলাধুলো।

বৃদ্ধেরা মাঠে আসেন সন্ধ্যের গায়-গায়। চেয়ারে বসে সারাদিনের গল্পের ঝাপি খোলেন।

মাঠের কাজে নেমে ঘুরে দেখে মহানন্দ। দুপুরের ঘুম-ভরা মাঠ যেন লগ্নগোধূলির আলোয় উঠে বসেছে।

সন্ধ্যের পর মাঠে লোক থাকে না। এখানে-সেখানে কশ্চিৎ কোন লোক কিংবা কয়েকজনের তাসের জমায়েৎ গ্যাসের আলোর নিচে স্থবির হয়ে থাকে।

আকাশে তারা ওঠে। বাতাসের একটানা গানে অলীক কথার মর্মর। নিজের ঘরের সামনে বসে মাঠের সঙ্গে কথা বলে মহানন্দ। মনে মনে।

ঘরের সামনের বাগানে বীজ ছড়িয়ে দড়মা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে মহানন্দ। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা মাথা তুলবে। ছোট-ছোট পাতার হাত তুলে সূর্যের আলো থেকে প্রাণ নেবে। বাতাস থেকে খাদ্য নেবে। জল থেকে রস নেবে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। বাইরে বসে থাকে। যেদিন চাঁদ ওঠে মাঠের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। ছায়ার অন্ধকারে স্নান করে। গুনগুন আসে ঠোঁটে। নীলকণ্ঠ-পাখির গান কি গাঁয়ের কোন উৎসবের গান।

এর মধ্যে নগরপিতা আরো দুদিন ঘুরে গেছেন।

অবশেষে অঙ্কুরিত বীজ তুলে নিয়ে লাগানোর সময় এলো। মহানন্দের বিশ্রাম নেই। সারাদিন খাটছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে আনন্দে কাজ করে যায়। পরিপাটি গাছ লাগিয়েও শান্তি নেই। ঠিকমত তদারক করা, ঝারি করে জল দেওয়া, পাখিদের ভিড় সামলানো, ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখা একলা যেন সামলে উঠতে পারে না মহানন্দ।

ছোট ছেলেমেয়েরা ভীড় করে এসে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে

যে সবচেয়ে ছোট সে আঙুল দেখিয়ে বলে, ফুলগাছ নাকি মালী ?

ক্ষেতের ভেতর থেকেই মহানন্দ উত্তর দেয়, হুঁ। একটু হাসেও বুঝি।

কী রঙের ফুল হবে মালী ?

কত রঙ-বেরঙের! ফুটলেই দেখতে পাবে খুকুমণিরা।

হলদে সবুজ সোনালি না ?

মাথা নাড়ে মহানন্দ। হালকা রেশমের মত চুলের ভার জমে আছে মেয়েটির মাথায়।

তোমার নাম কি খুকু ? উঠে দাঁড়ায় মহানন্দ।

কুঙ্কুম।

মহানন্দ এগিয়ে যায়।

ওমা ধরবে নাকি! মেয়েটা চিৎকার করে পালিয়ে গেল। সঙ্গে তার সঙ্গীরাও।

মেয়েটি প্রায়ই মাঠে আসে। রাস্তার ওপারের গলিতে থাকে। ও মাঠে এলে মহানন্দের কী যে ভাল লাগে! মনে হয়, আহা ও যদি তার কেউ হত! কে হলে যে সবচেয়ে ভালো হত এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। বেড়ার গায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একটু বুঝি উদাস হয়। মনটা কেমন-কেমন করে।

মুখ ফিরিয়ে গাছের দিকে চায়। বেশ বড় হয়ে উঠেছে কশমশরা। সরু গাছের মাথায় ঝাক বেঁধে উঠেছে ঝাকড়া পাতার দল। ডালিয়া খুব আস্তে বাড়ছে। সকালে জল দিয়ে ওদের তৃষ্ণা মেটায়। আগাছা কি ঘাসেরা কেউ তাদের বিরক্ত না-করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। ফুলের ঋতুতে মহানন্দ মাটিতে আর কারো অধিকার স্বীকার করে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আগাছা ছাড়ায় তারপর ঘরে ফিরে স্নান করে। দুপুরে যা' রান্না করা থাকে তাই খেয়ে ঘরের সামনে ঘাসের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

তারাভরা আকাশ। তারাঝরা আকাশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে কখন ঘুম এসে যায় মহানন্দের। মাঠের মাটিতে ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। মিষ্টি স্বপ্ন : মাঠে ফুলের মরশুম এসে গেছে। লানারিয়া আর লুপিনের তুলতুলে গালে মৌমাছিরা চুমু খাচ্ছে। কোথায় যেন বকের পালকের মত সাদা ধবধবে ফুলের মেঘ জমে আছে ড্যাফোডিল্সের মাথায়। আবলুশের মত অন্ধকার ভেঙে আবছা জ্যোৎস্না উঠেছে আর সেই আবছা আলোয় ক্রিসাম্থিমামের ঘুম ভাঙার হাইতোলা!

স্পষ্ট এ সব দেখতে পায় মহানন্দ। এক সময় ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসে তাড়াতাড়ি। চারদিক তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। সমস্ত মাঠখানা যেন অপরিচিত। রক্তকবরীর ডালে পাখি ডাকছে। কি পাখি কে জানে! ফোয়ারার ওপারে পরিটার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়। মাথা নাড়ছে মালতিলতার ঝোপঝাড়।

মনের মধ্যে স্বপ্নের ছবিগুলো আবার ওলটায়-পালটায়। জল-তরঙ্গের মত বাজে। উঠে পড়ে মহানন্দ। নিজের ঘরের দিকে হাঁটে।

একদিন উত্তর হাওয়ার খবর হল। তারা ফুলের চারায় শিশিরের ঝাপটা দিয়ে বললে, জাগো।

রোদের রঙ ফিরল। টকটকে গরদের চাদর ছড়িয়ে গেল মাঠে। ভিজে ঘাসের ভেতর তৃণ-পতঙ্গের দল আর হলদে ফড়িঙেরা উড়ে এল।

চারকোণা ফ্রেমের মধ্যে জলরঙের ছবির মত চিত্রল হয়ে উঠেছে কশমশেরা। কারো কারো ডালে জাফরানি রঙের ফুল নেমেছে।

বেগনি-গোলাপি ফুলেরা ঝাঁক বেঁধে এল ডালে। আর কশমশের গাছগুলো যেন গর্বে ভেঙে পড়ল বাতাসে। একপাল হঠাৎ-স্কুল-ছুটি-হওয়া মেয়েদের মত প্রগলভ হয়ে।

এমন সরস সজীব অসহায় গাছগুলোকে যেন শুয়োপোকা না ধরতে পারে। মহানন্দ সব সময়েই ওদের গা-ঘেঁষে ঘোরাঘুরি করে।

একদিন ব্লাকগোও ডালিয়া সকাল বেলায় সূর্যের চেয়ে লাল হয়ে দেখা দিল। ছায়া পড়েছিল ফোয়ারার জলে। এমন কি লাল-নীল মাছেরও গায়!

ওরাও এল। মনে-মনে ভাবে মহানন্দ। সকাল বেলায় ফোয়ারার কাছে কোথায় বুলবুলি ডাকছে। ভালো লাগে মহানন্দের।

রোজ সকালে এসে ফুলগুলো দেখে যায়। মানুষের হৃদপিণ্ডের মত লাল আর তাজা।

সেদিন বিকেলে মহানন্দ বাজারে গেছিল। ফিরতে দেরী হয়ে গেল। দূর থেকে দেখে বেড়ার ধারে একপাল ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে। তাদের একজন বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরেও ঢুকে পড়েছে। আচমকা চমকে উঠল সে। ডালিয়ার কথা মনে পড়ল। পড়ি-কি-মরি ছুটে গেল। চেঁচিয়ে উঠল বুকের সবটুকু জোর দিয়ে, এসো, এসো, বেরিয়ে এসো—

কয়েকটা গাছ নষ্ট করে ফেলেছে। দু'একটা কুঁড়িও ছিঁড়ে ফেলেছে। ফুলের কাছে তখনো পৌঁছতে পারে নি। তাড়া খেয়ে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মহানন্দ। সময়মত এসে হাজির হতে পেরেছে তাই রক্ষে নইলে কি হত কে জানে। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মমতা বোধ করে মহানন্দ। আহা, ওরা তো শিশু না-ধমকালেই হত। নতুন ফুল দেখে বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ছেলেমেয়েদের পলায়মান দলটির ওপর চোখ ফেলে সেই ছোট মেয়েটিকে খুঁজল। কি নাম যেন তার—কুঙ্কুম না কি। সে হয়ত আজ আসে নি। সে এলে ভাল লাগে মহানন্দের। খুসি হয়।

গাছগুলোর দিকে চোখ ফেরায় মহানন্দ। গভীর মায়া জমেছে তার বুকে। শীতের আকাশে ক্রমশ ভেজষ গন্ধের মত আদিম অন্ধকার উচ্চারিত হয়।

একদিন রোগি দেখা শেষ করে মাঠে এলেন নগরপিতা। দুপুরের দিকে। ততদিনে মাঠ ফুলে ভরে উঠেছে। তারাই যেন সাদর অভ্যর্থনা জানালো নগরপিতাকে।

মহানন্দর ঘরের সামনে লনটুকুতে বেলোয়ারি হাসির ঝড় আনলো স্বচ্ছ দীঘল ডাঁটির উপর হালকা বেগুনি রঙের বালবের মত হেয়ারবেলের কুঁড়ির ঝাক। হায়াসিন্থের নীল পাথরের মত পুরু ও উজ্জ্বল পাতার গা-ঘেঁষে বেগনি রঙের ফুল নয় ফুলের বুদ্বুদ ভেসে উঠল। কালো ব্রিয়ানিলতার ডালে হলদে-সবুজ ফুল জোনাক আলোর জলছবি তুলেছে ; ঝাকড়া পাতার আড়াল সরিয়ে থোকায় থোকায় সি-পিঙ্ক আর অমিত সবুজ মে পিঙ্ক-এর টুলটুলে ফুলগুলো মধ্যদিনের প্রজাপতির কাছে খুসির আহ্বান জানালো।

মিহি হাওয়ায় এইসব গাছের নিচেকার মসলিনের মত ফিনফিনে অন্ধকার মাঝে মাঝে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে।

নগরপিতা খুসির মুখ তুলে মহানন্দের দিকে তাকালেন। গলায় ষ্টেটিস্কোপ ঝুলছে। এইমাত্র ডিসপেনসারি থেকে উঠে এলেন।

ওরা তা'হলে এলো। হাত দুটো পিঠের ওপর ফেলে থেমে গেলেন নগরপিতা। এগিয়ে গেল মহানন্দ। তিনিও এগিয়ে বেড়ার গায় হাত রাখলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল বুঝি। আনন্দে। অস্ফুটস্বরে বললেন, I love not man the less, but nature more—বহুকাল আগে পড়া একটি কবিতার লাইন ভেসে আসে মনে। তিনি যেন নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁর যৌবনের স্মৃতি-বিস্মৃতির ছবি ফুটে ওঠে।

স্মিত মুখে তার দিকে চেয়ে থাকে মহানন্দ। বৃদ্ধ নগরপিতা নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যান। কেউ নির্জনতা ভাঙে না। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। আহা, চোখ যেন ফেরানো

যায় না। এক মরশুমের অলীক এই ফুলেরা যেন মাঠের চিরকালের সত্য। সুন্দর। আনন্দ।

মহানন্দের দিকে ফিরলেন নগরপিতা। তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তুমি আমার বন্ধু—আমার বন্ধু! কাঁপছিল তার গলা, ঈশ্বর তোমার হাত দিয়ে তাঁর বিচিত্র প্রকাশ এনেছেন!

সঙ্কোচে সরে দাঁড়ায় মহানন্দ।

দেখে সার্থক হলাম। একদিন নাতনিকে নিয়ে আসবো। সে ফুল বড্ড ভালোবাসে। অনেকক্ষণ থেকে গেলেন তিনি। হলদে রোদে ভেজা সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে হেঁটে-হেঁটে দেখে গেলেন ফুলের উৎসব।

কিছুদিন ধরে মহানন্দ সহজে মাঠ ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, বিশেষ করে বিকেলের দিকে। দুপুরে দরজার পাল্লা সরিয়ে কোয়াটারের ভিতর থেকে মাঠের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

দুষ্টু ছেলেরা ফুলশুদ্ধ গাছ তুলে নিয়ে যায়; লাল-নীল মাছদের গায় ঢিল ছোড়ে, আমগাছের মগডালে উঠে গল্প করে, মালতি লতার ডাল ভেঙে মুচড়ে ফুল নিয়ে যায়, অকারণে রক্তকরবীর গাছকে নাড়ায়।

মহানন্দ এগুলো বন্ধ করে দিল। তাড়া খেয়ে দুষ্টুছেলেরা অনেকখানি শান্ত হয়ে এল। ফুল ফেলে গাছ-পালা ফেলে তারা ময়ুর কাঠবেড়ালি আর গিনিপিগের ঘরের দিকে কৌতূহলকে ফিরিয়ে দিল।

মহানন্দের নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। সুখদুঃখ আনন্দবেদনার ভিন্নতর স্বাদ নেই। তার চোখে একটি মুগ্ধ ভুবন।

হীরে যেমন আলো কে প্রকাশ করে, মহানন্দের হৃদয় তেমনি মাঠকে প্রকাশ করেছে।

কোন দিন পথ-চলতি লোক পথ ছেড়ে মাঠে ঢোকে—আর ফুলের সমারোহ দেখে চোখে থাকে সম্পন্ন বিস্ময়। তাদের কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করে, মাঠের রঙ ফিরিয়েছ তুমি?

মহানন্দের গলায় তখন গর্ব। মাথাটা একটু নিচু করে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাইরে শীতের বাতাসে বেহালার ছড় ওঠা-নামা করে। পাতায় লেগে কান্নার মত কঁকিয়ে ওঠে। কান পেতে থাকে মহানন্দ। উসখুস করে। বারবার জানালার দিকে চায়। কখন ভোর হবে! কোনদিন বিছানায় থাকতে পারে না। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ঘুরে আসে। কুয়াসার মাঠে লোক থাকে না। মিত আলোয় ক্ষ্যাপার মতো ফুলের বেড়ার পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায় মহানন্দ। ফোয়ারার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পরির আকাশের দিকে তাকায়।

পাতার ভিড় ঠেলে অনেক ডালিয়া এসেছে। আবছা অন্ধকারে সবাই ডুবে আছে। আকাশের তারা গাছপালা পাখি ফোয়ারা নির্জনতা ঘুমের মশারি ফেলে সবাই নিথর। কোনদিন আকাশে চাঁদ থাকে। বুড়ি চাঁদ নিজেকে কুয়াসার চাদরে ঢেকে শীতে কাঁপে।

ভোর হতেই জলের ঝারি নিয়ে গাছে জল দেয় মহানন্দ। প্রত্যেকটা গাছ সে চেনে। পোকাধরা গাছকে ওষুধ দিয়ে ভাল করে। রুগ্ন গাছের প্রতি তার মমতার শেষ নেই। মায়ের মতো সব সময় স্নেহে আচ্ছন্ন করে আছে। গাছের গোড়ায় নতুন করে মাটি দেয়। সার ছড়ায়।

জল দিয়ে একটু বিশ্রাম পায় মহানন্দ। ভিজে মাঠে রোদ পড়ে। কুয়াসা উড়ে যায়। অগণ্য বাড়িঘরের নির্লিপ্ত অবস্থান, গাড়ি-ঘোড়া, লোক চলাচলের একঘেয়ে শব্দ সমন্বয় অকস্মাৎ যেন কুয়াসার কবর থেকে জেগে ওঠে। তখন অদ্ভুত মনে হয় মহানন্দের। শীতের প্রার্থনায় একটিও পাখি নেই। পাখির কূজন নেই। পাতার মর্মর নেই।

অনেকক্ষণের অহেতুক বেদনার মত কুয়াসার অবশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে একেবারে মুছে যায়। ঘাসের পাতায় শিশিরের হীরে ঝলমল করে। আলোর সোহাগ ফুলের কপালের মধুর হয়ে জমে থাকে।

কাঁচপোকার দেহের মতো ঝকঝকে নীল আকাশে কুঙ্কুমের কৌটার মতো সূর্য ওঠে।

তখন ঘর ঢোকে মহানন্দ। উনুনে আঁচ দেয়। চা করে। ভাত চড়িয়ে রসিয়ে-রসিয়ে চা খায়। চা খাওয়া শেষ হলে বাইরে গিয়ে :দাঁড়ায়। হলুদ রোদে গা ডোবায়। তখনকার মাঠ দেখে রাত্রের মাঠের কথা তার মনেও থাকে না। শিশিরে গা-ধুয়ে ফুলেরা আলগোছে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই সময়টা মহানন্দের মেজাজ খুব ভালো থাকে। দুষ্টু ছেলেরা স্কুলে যায়। মাঠে তাদের হুল্লোড় থাকে না। মাঠ নির্বিবাদে কাছিমের মত পিঠ পেতে রোদ পোহায়। সময়েরও যেন তাড়া নেই।

সেদিন মহানন্দ পরির হাতের উপর নীলকণ্ঠ পাখি দেখে অবাক হয়ে গেল। না, একটা নয় দুটো পাখি। তারই চোখের সামনে সহরের উপর দিয়ে উড়ে এল। এগিয়ে গেল মহানন্দ। আশ্চর্য নীল রঙ! অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মহানন্দ। পলক নামে না। শিথিল শিস্ দিল তারা। দুজনই। আমের পাতায় কাঁপন উঠল।

এ পাখি তো মহানন্দ দেখেছে তাদের গাঁয়ে। পরির হাতের উপর তারা বসে থাকে। একজন আরেকজনের পালকে ঠোঁট ঘসে। ঠোঁট ডোবায়। বেড়ার গায় দাঁড়িয়ে দেখে মহানন্দ। ভাত চাপিয়ে এসেছে সে কথা মনেও থাকে না। পরির হাত থেকে উড়ে গিয়ে মাথার উপরে বসল তারা। আহা, শিস দিয়ে গান গাইছে। বোধ ভালোবাসার গান। মুগ্ধ হয়ে গেল মহানন্দ। ফোয়ারা জলে ছায়া পড়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়া লেগেছে। ওদের লেজের অহরহ নাচানাচি, ঠোঁটের নিবিড়তা প্রণয়লগ্নের সমীচীন রম্যতা দিয়েছে।

আঃ-হুস্। শব্দ করল মহানন্দ। উড়ে গেল পাখি দুটো। আর দেখা গেল না। মনে মনে খুশি হয় মহানন্দ। ওরা আসবে। আবার

আসবে। সহরের ইট-কাঠের মধ্যে আগামী বসন্তের নীড় দেখে গেল। পাখির পৃথিবীতে খবর দেবে। আমের মঞ্জরীর কালে তারা আসবে। সহরের এই বনবাসে। ঘরের দিকে এগিয়ে গেল মহানন্দ। বেশ হবে। বেশ হবে সামনের বসন্তটা। নিজের মনে মাথা নাড়ে।

বিকেলের আগে নগরপিতা পার্কে এলেন। তাঁর গাড়ি রাস্তার ওপারে না-থেমে এপারে থামলো। গাড়ি থেকে তিনি নামলেন। একলা নয়। সঙ্গে নাতনি। পড়ন্ত রোদে পিঠ মিলিয়ে এগিয়ে এলেন নগরপিতা।

ঘাস আব আগাছা তুলে ফুলের মাটি পরিস্কার রাখছিল মহানন্দ। জানতে পারে নি সে। নরম ঘাসে জুতোর শব্দ হয় না।

যে প্রজাপতিবা দুপুরে বেড়াতে এসেছিল তারা ঘরে ফিরছে। তাদেরি হলুদ বঙের কেউ নগরপিতার নাতনির মুখখানাকে ঘুরে উড়ে গেল। হাসল সে। অনিন্দ্য। নগরপিতাও হাসলেন!

মহানন্দ।

ফিরে তাকায় মহানন্দ। নিড়ানি হাতে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। নত হয়ে নমস্কার করে।

কতক্ষণ এসেছেন হুজুর?

এই তো এলাম। মঞ্জুলেখাকেও নিয়ে এলাম তোমার বাগান দেখাতে।

মঞ্জুলেখার ওপব চোখ পড়ল মহানন্দের। ঠোঁটের উপর আয়ত ও আলতো হাসি ছলছল করছে। সুন্দর কিছু দেখলে মহানন্দের ফুলের কথা মনে হয়। সাহেবের বাগানের চেরিফুলের কথা মনে হল।

নগরপিতা বললেন, চল হে ঘুরে দেখা যাক—। নাতনির দিকে তাকালেন তিনি।

আসুন। আসুন। মহানন্দ তাদের দিকে এগিয়ে যায়।

দাতুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জুলেখা। একটু বুঝি লাজুক। আঠেরো কি উনিশ বসন্তের মেয়ে। অবলীল লাবণ্যের মায়া সঞ্চারে সারাদেহে আলোছায়ার জলছবি।

বেড়ার গায় ঝুকে পড়ে মঞ্জুলেখা। ফুলের গায় হাত ছুঁইয়ে বলে, কী সুন্দর দাতু!

দাতু মাথা নাড়েন। শীতের হাওয়া লাগে তার দাড়িতে, তা বৈ কি! আর মহানন্দই তো করেছে সব। নিজের হাতে।

ওকে এর জন্যে পুরস্কার দেওয়া উচিত। দাতুর দিকে মুখ তুলে তাকায় মঞ্জুলেখা, তুমি কি বলো দাতু?

গুণীকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। নগরপিতা নাতনিকে সমর্থন করেন। দাতু আর নাতনি সারা মাঠ ঘুরে দেখে। একসময় মঞ্জুলেখা দাতুর দিকে ফিরে দাঁড়ায়, ওকে আমি নেমন্তন্ন করতে চাই।

বেশ তো!

পলাশকে আসতে বলবো।

ভালোই হবে।

জানো তো ফুলের ওপর ও একটা বই লিছেছে। কিছু বলবে সে ফুলের ওপর। আর ও যা বলে—। ভাবলে একটু মঞ্জুলেখা, কথা নয়। চকমকির ফুলকি। তাকে মাঠটা দেখিয়ে নিয়ে যাবো। দাতু আর নাতনি তুজনে আগে হেঁটে যায়। মহানন্দ পেছনে।

এ মহানন্দের কম কৃতিত্ব নয়। কবিতা লিখেছে বলা যেতে পারে। দাতুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় মঞ্জুলেখা। চোখের চকিত বিত্যুতে মহানন্দকেও একবার দেখে নেয়।

তার বেশিও বলা যেতে পারে। নগরপিতা চোখ বুজে উত্তর দেন।

তু' একজন প্রেস রিপোর্টারকে খবর দেওয়া যেতে পারে।

তুমি সভাপতি হবে। একটা গ্রুপফটোই খবরের কাগজের পক্ষে যথেষ্ট। আপত্তি নেই তো?

নগরপিতাকে একটু অন্যমন মনে হয়।

ন্‌-না না। বলছিলাম। থামলেন নগরপিতা। বুঝি একটু ভয়ে ভয়ে তাকালেন নাতনির দিকে, ওসব ঝনঝাটে—

কী বলছ তুমি দাদু! 'চণ্ডালিকা'র সেই ফুলের গান দিয়ে সুরু হবে। ওঃ, যা ডিসেণ্ট্‌ হবে। সেদিনের সভার একটা স্কেচ্‌ দেখতে পেল বুঝি মঞ্জুলেখা, এই উপলক্ষে একটা পার্টি দেওয়া যেতে পারে। বলো তো ফ্লোরাল পেটিংস-এর একটা এক্‌জিবিস্‌ন্‌ করা যাবে। খুসিতে ডগমগ করে মঞ্জুলেখা।

তা' পারো। তবে আমাদের দু'জনের সভাতেই মহানন্দকে ভাল মানাতো দিদি ভাই।

মঞ্জুলেখা দাদুর কথায় কান দিল না। চিন্তিত ভাবেই প্রশ্ন করল, কি দেওয়া যায় বলো তো?

কিছু ভেবেছিস নিশ্চয়ই।

ভেবেছি অবিশ্যি। একটা ঘড়ি—

হেসে উঠলেন নগরপিতা।

বা-রে তুমি হাসছো কেন দাদু? ঠোঁট ফোলায় মঞ্জুলেখা, একটা কিছু তো বলবে!

ওকি কলেজে যায় দিদিভাই—না, তোমার মত পার্টিতে ওকে পাঙচুয়ালিটি মেনটেন্‌ করতে হয়!

বলবে তো ছাই কি দেওয়া যায়? মঞ্জুলেখা অধৈর্য হয়ে পড়ে। দিতে চাস তো কাশ্মিরী শাল—টাল—

দি আইডিয়া। লাফিয়ে ওঠে মঞ্জুলেখা।

আরো ভালো হয় যদি নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াস। সকৌতুকে নাতনির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নগরপিতা।

ঠোঁট ওলটায় মঞ্জুলেখা, সে কেমন করে হবে!

আচ্ছা থাক তবে। প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন তিনি।

একটু দাঁড়ায় মঞ্জুলেখা। কশমশের মতো নকনকে শরীর। তোমাকে নেমতন্ন করছি মহানন্দ আমাদের বাড়িতে। সামনের শনিবার। অবশ্যই আসবে। দাহু, তুমিও বলো ওকে—তার চোখে একটি আলোর প্রতিসরণ বিকেলের বিহ্বলতার ঝকঝক করে।

তোমার নেমতন্ন রইল মহানন্দ। আমি নিজে নিয়ে যাবো তোমাকে। নগরপিতা নিমন্ত্রণ করলেন।

মহানন্দ উত্তর দিল না। শুধু মাথা নাড়লো।

কয়েক পা এগিয়ে গেল মঞ্জুলেখা। হেয়ারবেলের টোল খাওয়া গালের উপর ঝুঁকে পড়ল।

কি হোল ? নাতনির দিকে এগিয়ে যান নগরপিতা।

ফুল নিতে ইচ্ছে করছে বড্ডো। কেটে কেটে উচ্চারণ করে মঞ্জুলেখা।

কি নিতে ইচ্ছে করছে ?

ফুল, হাসলো মঞ্জুলেখা, তুমি আজকাল কানেও কম শোন দাহু ? মহানন্দের দিকে ফিরে তাকালেন নগরপিতা। লজ্জিত হলেন। সঙ্কোচ বোধ করলেন। তবু নাতনির দিকে চেয়ে বললেন, এ ফুল তো তোলবার জন্য নয় দিদি।

জানি। মঞ্জুলেখার গলায় আধো আধো সুর, কিন্তু খোঁপায় যে দিতে ইচ্ছে করছে।

অনেকখানি সরে গেছিল মহানন্দ। ভয়ে কাঁপছিলো।

বাঃ রে আজ যে মিলিদের বাড়ি পার্টি। খুব মানাবে—নাইস ! মহানন্দ হেয়ারবেল না দিতে পারলে লার্কস্পার্কেও চলবে—

অন্ধকারে মহানন্দের মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। সারা মাঠের কোলাহলের ভেতরেও তিনজনের মধ্যে স্তব্ধতা ছলছল করে।

হঠাৎ বেলোয়ারি কাচের মত হাসিতে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে

মঞ্জুলেখা, তোমাকে ভয় দিচ্ছিলাম মহানন্দ। তারপরই ব্যস্ত হয়ে দাদুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, শনিবারে এসো এ্যা—নিজের মনেই উচ্চারণ করে, বড্ড দেরী হয়ে গেল, কি ভাববে মিলি।

নগরপিতা বিদায় জানালেন মহানন্দকে, আসি—

একলাই দাঁড়িয়ে থাকে মহানন্দ। আকাশে তাবা উঠেছে। এক তারা। দুই তারা। তিন তারা। ঘরে ফিরে এল সে।

শনিবার সন্ধ্যেবেলা নগরপিতা এলেন। বললেন, চলো মহানন্দ।

কাঁদো-কাঁদো গলায় মহানন্দ বলে, আমাকে রেহাই দিন হুজুর।

কেন?

সাহস হয় না। ভয় করে।

ভয় কিসের হে আমি তো থাকবো!

হুজুর, বুড়ো মানুষ—গাছপালাব সঙ্গে দিন কেটেছে। লোকের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনি।

যাবে না তুমি?

হুজুর যদি—

বলছো?

আজ্ঞে, যদি রেহাই দেন।

বেশ তবে তাই হোক। ভীড়ের মধ্যে তোমাকে টেনে নেব না। বোধহয় তুমি না গেলেও ওদের চলবে।

নগরপিতা ফিরে গেলেন। অন্ধকারে বসে থাকে মহানন্দ।

ফুলের এক ঋতু শেষ। যে সমারোহ মাঠ ভরে জেগে উঠেছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রৌদ্র এল। তাপ এল। গাছে নতুন পাতা এল।

মাঠে কোথাও ফুল নেই। শুধু মাধবীর জনপদ ফেনিয়ে

উঠেছে আবার। হাওয়ার হাত থেকে খবর হল ভীরু খরগোশের মতো গন্ধেরা পালিয়ে গেছে।

মহানন্দের ঘরের সামনে অতি তন্বী এক গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কী স্পর্ধা ওর আকাশ ছোঁবে নাকি! সমস্ত মাঠে সে একা।

একদা চিত্রল সন্ধ্যায় একটি কুঁড়ি ফুল হয়ে উঠল তার শাখায় শিখরে। সূর্যমুখী নাম। ফুল তো নয় গোধূলির আকাশে গানের আলাপ। আর তারপরেই এমন কয়েকটি বিকেল এল যা বছরের একটি ঋতুতেই আসে। সূর্য নেমে গেলেও অনেকক্ষণ সেই বিহ্বল বিকেল যাই-যাই করেও সন্ধ্যেকে ছুঁয়ে থাকে।

বাড়ির বারান্দায় বসে সূর্যমুখীর দিকে চেয়ে থাকে মহানন্দ। কি সব কথা মনে হয়। রাত্রে ঘুমিয়ে সূর্যমুখীকে স্বপ্ন দেখে। ভোর বেলা উঠেই ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। ঘুমের কুণ্ঠিত বিবরণ লেখা সূর্যমুখীর মুখের দিকে চেয়ে দিন প্রসন্নতায় ভরে ওঠে।

চড়াই কি মুনিয়া ডালে বসলে মহানন্দ তাড়িয়ে দেয়। পলকা ডাল ভেঙে যাবে যে! বুক দুর-দুর করে। মহানন্দের সমস্ত চেতনা সূর্যমুখীর হলুদ বৃত্তকে ঘিরে থাকে। হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় যেন সে।

নগরপিতা অনেকদিন মাঠে আসেন নি। একদিন তাকে ডেকে এনে দেখাবে।

সেদিন বিকেলে পৃথিবী আশ্চর্য হল। রূপসী মেয়েকেও এক-একদিন আরো সুন্দরী দেখায়। মেঘের ঠোঁটে সন্ধ্যা বিচিত্র মায়া জ্বালালো।

তারপর একগলা খসখসে ছায়ার অন্ধকারে সূর্যমুখী ডুব দিল। ঘরে এসে রান্না চড়িয়ে দেয় মহানন্দ।

বাইরে কখন জ্যোৎস্না ফুটলো। ঈষন্নীল অন্ধকারে রুপোলি কথার শস্য উঠলো। দক্ষিণ হাওয়া বনকে পাগল করে। মনকেও।

সেই কখন বেশ রাতে মহানন্দের রান্না শেষ হল। খেয়ে-দেয়ে যখন বাইরে এল, দক্ষিণ হাওয়ার দুরন্তপনা পৃথিবীকে উতল করে তুলেছে। কাঁপন লেগেছে সূর্যমুখীর। ডালপালা বোঁটায় নকনকে রুপোলি আস্তর খুলেছে।

মহানন্দের চোখ হঠাৎ নিচে নেমে এল। সূর্যমুখী গাছের নিচে কারা বসে আছে। ছায়া পড়েছে বেড়ার তাই বোঝা যায় না। একটি মুগ্ধ মুখ আর একটি স্নিগ্ধ চোখ। মগ্ন হয়ে আছে দুজন। অপরিচিত মিষ্টিগন্ধের মেঘ করেছে হাওয়ায়।

মাথার ওপরে সূর্যমুখী কাঁপছে। আহা, আজ যে ওর কি বাহার খুলেছে!

একটু দূরত্ব বজায় রেখে নিজের ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বসে গেল মহানন্দ।

চাঁদ মাথার ওপর উঠলো। মাঠ ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু তারাই দুজন বসে আছে। তাদের সবকথা মহানন্দের কানে আসে না।

তবু একটি পৃথিবীর ধূসর আভাস অনুভব করে। নিজের যৌবনে কখনো যাকে স্বপ্নে ছুঁয়েছিল।

যেসব ফুলেরা বিগত ঋতুতে শেষ হয়ে গেছে তারা মুখ তুলল। তাদের রঙীন নিঃশ্বাস অনাগত যুগের অজাতকুসুমের জন্যে পৃথিবীতে বসন্তকে লিখে রেখে গেল।

এক-একবার ওদের একজনের মুখে আরেকজনের পৃথিবী তন্ময় হয়ে নেমে আসে। তখন অনিন্দ্য রূপকথা যেন সময়ের অন্ধকার চৈত্যে শরীরী।

এক সময় তারা দু'জনে ওঠে। তারপর বিহ্বল রাত্রির সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে যায়। যতদূর দেখা যায় মহানন্দের চোখ অনুসরণ করে। বুকের মধ্যে একটা বেদনার অনুভব পেল নীলার মত নীল। কান্নার মত গভীর।

সূর্যমুখী মাথার উপর হাই তুলছে। উঠে দাঁড়ায় মহানন্দ। আজ রাতে আর ঘুম হবে না। ঘুমুলে যে স্বপ্ন দেখত জ্যোৎস্নায় যেন সেই স্বপ্নের অভিনয় হয়ে গেল। পৃথিবীকে কি আশ্চর্য মনে হয়।

শেষবার তাকালো সূর্যমুখীর দিকে; যেখানে তারা দু'জনে বসেছিল, যে মাঠে তাদের কথার ফুলঝুরি ঝরে রয়েছে, যেখানে তাদের হৃদয়কে নিঙড়ে রেখে গেছে সেই মাঠে সূর্যমুখী আজ রাতে বাসর জাগবে।

ঘরে ঢুকে গেল মহানন্দ। দু'চোখে ঘুম টলমল করছে। সারাদিনের খাটনির তো শেষ নেই। জল দিয়ে ঘাস বাঁচানো, কাচি দিয়ে বর্ডারের কাঁটাগাছ ছেটে সমান রাখা, বেড়া বাঁধা, এ্যাষ্টর-গ্যালাডোলিয়া-ইয়কার মাটি তৈরী করা, আরো এটা-সেটা কাজের শেষ আছে নাকি?

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব বেলায়। রোদ উঠেছে। তখনো শিশিরের সময় বয়ে যায় নি। বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। কাল রাতের স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটে নি। কেমন যেন শিথিল হয়ে বিছিয়েছিল।

আরে! চেঁচিয়ে ওঠে মহানন্দ, সেই ফুলটা—সূর্যমুখী!

সকালেই কারা যেন গাছটাকে নুইয়ে ভেঙে ফুলটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

মুহূর্তেই পৃথিবীর মুখ পালটে গেল। একটা ভয়ঙ্কর ভাঙাচোরা কালো অন্ধকার তার চোখে লেপটে গেল। ঠোঁটের কাছাকাছি কয়েকটা শব্দ অস্ফুট হয়ে মরে গেল, ফিরে দাও যে ফুল রাত্রির শিশিরে স্বপ্ন হয়ে আছে—

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মহানন্দ। কান্না এল তার। বুকের এপার-ওপার ভাসিয়ে। নিষ্ঠুরের হাতে সুন্দরের মৃত্যু!

বারান্দায় পড়ে রইল মহানন্দ। গায়ের ওপর দিয়ে রোদ বয়ে

গেল। প্রজাপতিরা ছায়া মেলে গেল। দরজার গায় হেলান দিয়ে বসে রইল সে। মৃত্যুর মত নিথর নির্বিকার।

কেউ নেই। কাকে দুঃখ জানাবে। বুকের ভেতর একটা নিরবয়ব শূন্যতা অথৈ হয়ে উঠেছে। মনে পড়ল। একখানা কচি কাঁচা মুখ। সোনার আগুনে তাকে রেখে এসেছে। আহা, আজ যদি সে থাকত। দিন আর রাত্রির পলি জমে ধূসর হয়ে গেছে সেই মুখ। সে মুখ একদা যৌবনে মুখোমুখী সুখের বিহ্বলতায় সূর্যমুখী হয়েছিল। সহসা কালের হাত তাকেও এমনি করে ছিঁড়ে নিয়েছিল। জীবনকে মনে হল বিস্বাদ। মনে হল লবণাক্ত। টলতে-টলতে উঠে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লো মহানন্দ।

বসন্ত গেল। সারাটা গ্রীষ্ম পার্ক একটা নিষ্ফল আবেদনের মত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকটা অগোছাল রজনীগন্ধা ছাড়া কোন ফুল ফোটেনি।

ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো মহানন্দ। আবার নতুন ফুলের আয়োজন গুনগুন করে তার মনে।

স্ন্যাপ্‌ড্রাগনের বীজ ছড়িয়ে দিল মাঠে। পুরোন দিনের মত আবার ঘুরে বেড়ায়। গাছে হাত দিলে ছেলেদের তাড়া করে।

মনে-মনে হিসাব করে সামনের ঋতুতে কী কী ফুল লাগাবে। কসমসের জায়গা পালটে দেবে। হেয়ারবেলের পরিধি আরো বাড়িয়ে দেবে। মে-পিঙ্ক পোর্টুলেকা সুইট-পী লার্কস্পারের বিনুনি আরো ঘন করে দেবে।

মহানন্দের কাজে আবার জোয়ার এসেছে। উৎসাহ পেয়েছে সামর্থে। নতুন হয়ে উঠেছে মনে।

আগামী ঋতুতে যারা আসবে তাদের জন্যে কাজ করে অবসর পায় না। গত বছরে যেটুকু ফাঁকি ছিল এবার পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ যেন বলতে না-পারে এমন কোথাও দেখেছি।

একদিন সকালে মাঠের বড়ো গেট খুলে গেল। একদল কুলির বিশৃঙ্খল [illegible] চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মালভরতি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কয়েকটা গাড়িও ভেতরে ঢুকে এলো।

চেঁচিয়ে ওঠে মহানন্দ।

ততক্ষণে গাড়ীর চাকা বেড়া ভেঙে গাছের ওপর দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে।

এই-ই। মহানন্দ ছুটে গেল তাদের দিকে।

কেউ খেয়াল করল না।

গোষ্ঠীবদ্ধ যান্ত্রিক নিপুণতা ভারি ভারি মাল নামাতে শুরু করে দিয়েছে। থরথর করে মাটি কাঁপে। কুলিরা তাঁবুর ত্রিপল নামায়। গাঁইতি, শাবল, কোদাল আর হাতুড়ি গাড়ি থেকে ফুলগাছের ওপর ছুড়ে ছড়িয়ে ফেলতে থাকে।

ইস্পাতের চাকার নীচে গ্ল্যাডোলিয়া চাপা পড়ে গেল। থেঁথলে ভেঙে নেতিয়ে পড়ল ঈয়কার শোলার টোপরের মত সাদা ফুলের ঝাড়। রজনীগন্ধারও বীভৎস অপমৃত্যু হল।

একটা নিবিড় যন্ত্রণার আর্তনাদ ঘনিয়ে ওঠে। চারদিকে বিপর্যস্ত অবসাদ।

কনস্‌ট্রাক্‌সানের অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার হবে মাঠে।

মহানন্দ অবাক। কিছুই তো জানত না সে।

কালের উপকূল থেকে একটি জনপদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুমের, অসতেক, ব্যাবিলন আর মহেঞ্জোদরোর ধূসর সুন্দর সভ্যতার মতো।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ক্রমশঃ মৃত্যুর নিঃশ্বাস শোনা গেল। লোমশ আচ্ছাদনের নিচে মাঠ ডুবে যাচ্ছে।

এমন সময় নগরপিতা মাঠে এলেন। কুলিরা সরে গেল। কুলিদের বাবুরাও। মহানন্দের হাত ধরে একধারে টেনে নিয়ে গেলেন। ভেজা গলায় জানালেন, ওদের পরিকল্পনা পালটেছে। নতুন কোলকাতার জন্যে নতুন পথ মাঠের ওপর দিয়েই যাবে।

আপনি বাঁচাতে পারেন না হুজুর? নগরপিতার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে মহানন্দ, মাঠকে আপনি বাঁচান। কেঁদে ফেলে সে, কিছুই রইল না—কি নিয়ে বাঁচবো। আপনি পারেন না।

মাথা নাড়েন নগরপিতা। খুব আস্তে, না, আমিও পারি না। একটু থামলেন তিনি, কেউ পারে না। প্রয়োজন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সুন্দরকে মানে না।



সোনালি রুপোলি মাছ

পশুপতি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল তখন বিকেল চারটে। পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে এক পশলা সোনালি রোদের বৃষ্টি হচ্ছিল। কালিপড়া কুৎসিত কলকাতার ক্লান্ত মুখে সে এক আশ্চর্য আলো। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালো। হেমন্তের এই সময়টা তার সবচেয়ে ভালো লাগে।

বাড়ী থেকে হেঁটে শিয়ালদায় এসে গাড়ি ধরেছিল। সেখান থেকে ট্রামে পার্কসার্কাস। দিদির বাড়ী। বসতে হল একটু তারপর বের হতে রাত্রি হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরেই মেঘ চলাচলের সঙ্কেত বিদ্যুৎ হয়ে উঠেছিল। আর এমন ভাগ্য দিদির বাড়ী থেকে ট্রাম ষ্টপে আসতেই বৃষ্টি সুরু হল। ঘন মেঘের আষাঢ়-শ্রাবণ কার্তিকের আঙিনায় হাজির।

বৃষ্টির ঝাপটায় নাকাল হয়ে কোন রকমে রাস্তার একটা দোকানের গা-ঘেঁষে দাঁড়ালো। না, ভিজতেই হবে আজ। এরি মধ্যে পথ থেকে লোকজন উধাও। কপালে ভোগান্তি আছে। তবু

যদি কোন দোকানের মধ্যে উঠে দাঁড়ানো যায়। বেশ শীত করছে। অসময়ে এমন বৃষ্টির কথা ভাবতেও পারে নি।

প্রথমে একটা মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে রঙের দোকানে গায়ে গিয়ে দাঁড়ালো। এখানেও সুখ নেই। এক চিলতে বারান্দা আগে থেকেই বোঝাই হয়ে আছে। দোকানের হাতার সামনে টিনের চাল থেকে জল গড়াচ্ছে। সেই জল ছড়িয়ে চারদিকে। এ আর এক অস্বস্তি।

পাশ ফিরেই দেখে ছোট একটা দোকান এবং ফুলের। বড় বে-মানান যেন। (রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফুটপাথও ডুবুডুবু।)

দোকানে লোক নেই! সাজানো পরিপাটি দোকান, মাটির ফুলদানিতে সাদা ফুলেব অনিন্দ্য মুখ। মুখ ফিরিয়ে আবার বৃষ্টির দিকে আবার চেয়ে দেখল পশুপতি।

এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে ; সঙ্গে বাতাসের মাতামাতি!

দোকানে না ঢুকলে আর চলছে না। বারান্দায় উঠে শরীরের যতটা পারলো দোকানে ঢুকিয়ে দিল। ওর মত আরো কয়েকজন অনাহূতও ঠাঁই নিয়েছে।

এতক্ষণে সিগারেটের কথা মনে হল। বাতাসের হাত এড়িয়ে সিগারেট ধরাতে পেরে স্বস্তি পেল পশুপতি। বাড়িতে থাকলে এই বৃষ্টির অন্য স্বাদ পাওয়া যেত। জানালার একটুখানি খুলে মিশনের ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে দেবদারু গাছের দিকে চেয়ে থাকা। বাইরেও অন্ধকার। ঘরেও অন্ধকার। চোখে কিছু দেখা যাক-না-যাক কানে আসে বৃষ্টির একটানা শব্দের নূপুর। কখনো ভেজা বাতাসে জলের কুয়াসা। স্বর্ণ চাঁপার গন্ধের ফিস ফিস। তার সঙ্গে সেই পোড়া বাড়ীটার অবস্থিতি। প্রাচীন রূপকথার মতো অদ্ভুত একটু সময়, হয়তো তার মুখের আদল অপরিচিত কোন রাজকন্থের মুখের মতো সুন্দর অথচ বিষণ্ণ! পৃথিবীতে যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইঃ! শব্দ করে পশুপতি। উপরের আলোটা চোখে এমন লাগছে। বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। ট্রামগুলো জন্তুর মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

বেশ একটু রাত্তির হল। আশ-পাশের লোকেরা বোধহয় কাছাকাছি থাকে। তাই তারা অনেক আগে চলে চলে গেছে।

পশুপতির মনে হল দোকানের মালিক এবার বোধ হয় দোকান বন্ধ করে দেবে। নেমে দাঁড়াতে হবে পথে। দাঁড়াবে আর কোথায়! জলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হবে। পার্কসার্কাসের মোড় থেকে বৌবাজার। তবু অবস্থাটা বুঝে নেবার জন্যে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে কি আশ্চর্য এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। পশুপতিও বোধহয় কিছুক্ষণ চেয়েছিল তারপরই হঠাৎ নিজেকে নির্লজ্জ মনে হয়। অপরিচিতা মেয়ের দিকে এমন করে তাকানো অশোভন। মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালে গা-ঘেঁষে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জলের ছাঁট লেগে চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ওরি মধ্যে কেমন উন্মনা হয়ে গেল পশুপতি। হিজিবিজি সব ভাবনা জলছবি হয়ে ওঠে।

খেয়াল নেই কতোক্ষণ হবে। হঠাৎ শুনতে পেল পিছন থেকে কে বলছে, কেউ কি দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে?

গা জ্বলে গেল পশুপতির কথা বলার ধরণ দেখে। দাঁড়িয়ে যে আছে সেটা তো চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিল না।

আবার শোনা গেল, কেউ কি দাঁড়িয়ে আছেন?

ফিরতে হল পশুপতিকে। একটি সাংঘাতিক কিছু উত্তর দিয়ে বৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন মনে হল এবং সেই উদ্দেশ্যেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মেয়েটি ঠিক তেমনি করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই খুশি-খুশি হাসিটাও ঠোঁটে আলতো জড়িয়ে।

একটু অবাক হয়ে যায় পশুপতি। চোখে দেখছে অথচ এ

ধরনের অমায়িক ঠাট্টার উদ্দেশ্য। তৎপর হয়ে জিজ্ঞেস করে, দেখতেই তা পাচ্ছেন—

দেখতে পাইনে।

পশুপতির হাত থেকে সিগারেট পড়ে যাচ্ছিল। সামনে নিল কোন মতে। আশ্চর্য দুটো চোখ তবু চোখে দেখে না!

রাস্তায় বোধ হয় জল জমে গেছে? মেয়েটি অস্ফুট প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। ছোট উত্তর দিয়ে পশুপতি রাস্তার দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

আপনি কি কাছেই থাকেন?

না, ঠিক কাছে নয়। বৌবাজারে।

ওঃ। মেয়েটি কি ভেবে নিজের মনে স্বগতোক্তি করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পশুপতি দোকানের চারদিকে এই ফাঁকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ফুল ছাড়া কিছু নেই! ফুলের বিপনি এটা। সাদা ফুলের সমাবেশ। অবাক লাগে কারা এখানে ফুল কিনতে আসে।

বৃষ্টির দিকে চেয়ে পশুপতি বলে বৃষ্টি ধরে এলে বোধ হয়।

ধরে এল! মাথা নাড়লো মেয়েটি, আমার লোকটা আজকে বোধহয় আসতে পারবে না। বুড়ো মানুষ। শেষের শব্দ দুটো অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে নিঃশ্বাস ফেলে সে।

মেয়েটি দেখতে পাচ্ছে না এই এক সুবিধে। চোখ ফেরাতে পারে না পশুপতি। তার যৌবনের যন্ত্রণার দিনগুলি বেদনায় অলীক। নিজের কদাকার চেহারা তাকে সঙ্কোচের নেপথ্যে সরিয়ে রাখে।

আজ এই আশ্চর্য সুযোগের মুখোমুখি নিজেকে বয়োসিদ্ধান্তে ভাস্বর মনে হল। প্রতিদিনের একঘেয়েমির মাঝখানে হঠাৎ একটু রূপকথা। কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। অঘ্রাণের দিনে বসন্তের আভাস।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে বৃষ্টি একেবারে ধরে গেছে। পশুপতি পথে নামার জন্য পা বাড়াচ্ছিল কি ভেবে বললো, আপনার অসুবিধা না হলে পৌঁছে দিতে পারি।

পারেন? মাথা উঁচু করে মেয়েটি পশুপতির দিকে কান পাতলো। তারপর বলল, তা' হলে আর দেরি করবো না। রাত বোধ হয় ন'টা বাজে। মা হয়তো ভাবছেন। তালা এগিয়ে দিয়ে বললো, ধরুন—আলোটা বন্ধ করে দি—আপনি বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

তালা বন্ধ করে পশুপতি চাবিটা মেয়েটির হাতে দিল।

নিন। হাতটা সামনে ধরে মেয়েটা। ছোট্ট-একটা সবুজ পাথর চিকচিক করছে অনামিকায়।

বুকের মধ্যে টিপটিপ করে ওঠে পশুপতিব!

কই ধরুন!

কপালে বোধহয় ঘাম দেখা দিয়েছিল পশুপতি—হাতও একটু কেঁপেছিল। তবু বাড়িয়ে দিল।

জলে পা দিয়েই পশুপতি বলে, ইস কি ঠাণ্ডা!

মেয়েটি ইতস্তত করছিল।

আপনার জুতো নষ্ট হয়ে যাবে।

তা' যাক!

কাপড়টাও।

হাসল সে। তারপর জলে পা নামিয়ে দিল।

অন্ধকার পথ। বিদ্যুৎ বিকল হয়ে অন্ধকার নেমেছে। অনেক খানি হেঁটে আসবার পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম?

আমার নাম। উচ্চারণ করে পশুপতি। তারপর অসহায়ের মতো হাতড়াতে থাকে। বন্ধুরা তাকে পশু বলে ডাকে। পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গর্ব করবার মতো কিছুই পায় নি। তবু নাম দেওয়ার ব্যাপারটা তাদের আয়ত্বের মধ্যে

ছিল আর সেটার বেলায়ও তারা অসমীচীন অবহেলা দেখিয়েছেন। পশুপতি নামটাকে ঝেড়ে মুছে ছেঁটে-কেটে আধুনিক করবার কোন উপায় নেই।

কি হল, নাম বললেন না?

মনের মধ্যে অনেকগুলো পোষাকী নাম হেঁটে গেল। অথচ দেরি করবার উপায় নেই। তাড়াতাড়িতে তারি একটা ঠোঁটে তুলে নিল, আকাশ কুসুম—-তা'ও শেষ করতে পারলো না।

আকাশ কুসুম! মেয়েটি স্বরের পর্দা তুলে উচ্চারণ করলো, আকাশ কুসুম কি?

রায়। থতমতো খেয়ে উচ্চারণ করে পশুপতি।

ও!

এবার ফুটপাথে উঠছি! মেয়েটিকে ফুটপাথে তুলে আবার হাঁটতে থাকে পশুপতি। একটা অপরিচিত মেয়ের হাত ধরে নির্জন বর্ষার রাতে হাঁটা আজ সকালে উঠে ভাবতে পেরেছিল পশুপতি!

একটু আস্তে হাঁটুন।

লজ্জিত হল পশুপতি। ট্রাম কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে অফিসের দরজায় ধবনা দিতে গিয়ে এই হাল। পথে নামলেই দূরপাল্লায় পাড়ি দেওয়ার চাল ধরে।

সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে এসে হাঁফ ছাড়ে পশুপতি। এখানে আগেই জল নেমে গেছে। ভিজে পথ। তবু জলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হবে না।

নাসিরুদ্দিন রোড তো?

হ্যাঁ।

বাড়ির নম্বর মিলিয়ে পৌঁছে দিল পশুপতি।

আর একদিন কি দোকানে আসবেন? মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে।

আসবো। দাঁড়ালো না পশুপতি। অদ্ভুত একটা নেশা নিয়ে ফিরলো। সার্কাস অ্যাভিনিউর দেবদারু গাছের অন্ধকার পার হয়ে এল। তারপর চলতি একটা দশ নম্বর বাসে উঠে বাড়ী ফিরলো।

বৌবাজারের ছোট একটা মধ্যবত্তি গলির শেষ বাড়ীটা পশুপতিদের। জরাগ্রস্থ। জীর্ণ বাড়ীটার গায় স্থবির বৈদ্যুৎ আলো তখনো জ্বলছে। বৃষ্টির দিন। সারাটা পাড়া নি:সাড়! ; ক্ষতি নেই পশুপতির—পরিচিত কারো মুখের ছায়া এখন ভালো লাগবে না।

একতলার ভাড়াটেরা আজ তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে পশুপতি। আশ্চর্য! এইটুকু পথ আসতে সেই মেয়েটার স্মৃতি যেন নির্জন বন্দরে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহাজের মতো মনে হল!

নোংরা হয়ে গেছে গা-হাত-পা। শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চার জলে পরিষ্কার হয়ে ঘরে এল। পাশে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। আরসোলা আর নেংটি ইঁদুর তার চারপাশে 'মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রিমে'র পরীদের নাচ লাগিয়েছে। মায়ের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দাদার ফিরতে এখনো অনেক দেরি। বৌদির কথা আর ছেলেমেয়েদের কান্না এখনো থামেনি।

ময়লা ধরা দেওয়ালের গা বেয়ে ছারপোকারা অন্ধকার প্রত্যাশায় পালাচ্ছে। তাকিয়ে দেখলো পশুপতি : দেওয়ালের গায় টিপে-মারা ছারপোকার রক্তের দাগ একটা বিচিত্র নক্সার ছাপ হয়ে উঠেছে। পঁচিশ পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তাকিয়ে থাকতে অদ্ভুত লাগছে।

জানালা খুলে দিল পশুপতি। কানিসের গা বেয়ে যে অশ্বত্থের চারা মাথা চাড়া দিয়েছে তার পাতায় বাতাসের খস্ খস্ শব্দ।

খেয়ে নিলে হত। কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। খাওয়া-ঘুমোন ঘর-দোর নিজের অবস্থিতি যেন স্থূল সংস্থান মনে হল। ভিন্ন কিছু প্রত্যাশিত।

এক গ্লাস জল খেয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে হাতল ভাঙা ইজি-চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিল।

টিকটিকি ডাকলো। ঘরের মধ্যে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঃ অথচ তার হৃদয় অপঠিত কবিতার মতো, মনে হল পশুপতির। অনেকক্ষণ ধরে অনেকগুলো প্রেমের গল্পের কথা ভাবলো! কবিতার কথাও মনে আছে। অনেকগুলো উপমার কথা মনে হল ঃ হৃদপিণ্ডের মতো লাল সূর্যাস্ত ঃ দূরাকাংখা একটি দ্বীপের নাম; সাইরেনদের হাতছানি। (নেপথ্যে মনে হল) নির্জনতা, মৃত্যু, শান্তির পরিণাম!

উঃ ছারপোকা কামড়াচ্ছে। পিঠ চুলকোতে সুরু করে পশুপতি। তারপর পাশ ফিরলো।

ফুলের গন্ধে ফসল ধরেছে। একটা চাকরি। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা। বোধহয় দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে এল তার।

একটা জোনাকির চকমকি জ্বলছে। নিভছে। কাঠবেড়ালিটা কী করছে এখন? নেবু পাতার নিঃসঙ্গ মর্মর। একটা পরিমিত বাগানে অন্তরীন অন্ধকার অস্থায়ী তাঁবু ফেলেছে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দাদা একরাশ মদ গিলে এসে মাতলামি করছে। দরজা খুলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল পশুপতি।

সকালে বাজার সেরে টিউশনিতে বের হতে হল। মোড়ের দোকান থেকে ডবল হাফ চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বেলেঘাটার মোড় অবধি হেঁটে গেল। সেখান থেকে বাস-এ যাবে। সকালে গোটা দুই টিউশনি শেষ করতে হয়। বিকেলেও আছে কয়েকটা। চাকরির আশা সুদূরপরাহত। এমনি করেই দিন কাটাতে হবে। মেধাহীন ছাত্রের জন্য অসামান্য পরিশ্রম, সামান্য রোজগার।

দুপুরে বাড়িতে ফিরে ময়লা-পড়া শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চায় হাজা-

বালতিতে কোন রকমে স্নান সারা, তারপর একঘেয়ে মুসুরির ডাল, তরকারি আর আম কি তেঁতুলের অম্বল দিয়ে ভোজন সমাপন। কোনদিন সস্তা হলে অকুলীন গোছের একটু মাছ জোটে তাও ঝোলের জলীয় সংস্করণের নিচে এমন ভাবে অবলুপ্ত থাকে যে অনেক তকলিফ করে হাতড়ে খুঁজে নিতে হয়। ঘেন্না ধরে গেছে পশুপতির। অহরহ অভিশাপ দিচ্ছে জীবনকে—কিন্তু ভেঙে ফেলবার সাহস কোথায়! কাপুরুষ সে। দুর্বিসহ গ্লানিকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লেখা ছাড়া করবার মতো কিছু নেই।

এত দেরি হয় না কোনদিন। আজ এক জায়গায় ছুটি পাওয়া গেছিল। ছাত্রের মাসিমার বিয়ে। তাই অফিস পাড়ার দিকে ঘুরতে গেছিল। অনেক জায়গায় দরখাস্ত দেওয়া আছে। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে বসে থাকা যায় না। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিয়ে আসে। দরখাস্তের বড়শিতে চাকরির টোপ গেলার সম্ভাবনা আছে কি না!

ডালহৌসী পাড়ায় হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে একটি সুখের অনুভব পেয়েছে।

একটি চাকরি। নিশ্চিন্ত জীবন। কত কাছাকাছি। অথচ কতদূর! কতদিন পরিচিতদের ধোঁকা দেবার জন্যে দশটায় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়েছে। তারপর কার্জন পার্কে কি গঙ্গার ধারে কাটিয়ে পাঁচটার মিছিলে গা মিলিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

রকে-বসা রিটায়ার্ড প্রবীণদের কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, কি হে কিছু জুঠলো?

একটু দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছে পশুপতি, লিভ ভেকান্সি—

ওই হোল। অমনি করে কিছু-একটা জুঠে যাবে দেখো—

চলি। একটু থেমে বলে পশুপতি, সারাদিন যা খাটনি!

আচ্ছা, এসো বাবা।

এত দেরি! মা জিজ্ঞেস করেন।

ডালহৌসির দিকে গেছলাম্।

এই একটি কথায় মা চুপ করে যান। পাড়ার সবাই চাকরি করে। শুধু পশুপতি বাদে।

দুপুরে পশুপতি খেয়ে শোয়। সেই সময়টা পশুপতির নিজের। খেয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর খাটের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। চিল গোনে! আকাশে মেঘ থাকলে তাদের নিয়ে অদ্ভুত সব ভাবনা ভাবে। তার পর ঘুমোয়। ঘুম না-এলে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে জানালার কাছাকাছি শুয়ে কবিতা লেখে। লিখে নিজেই পড়ে। পড়ে খুশি হয়। কাটাকুটি করে। কখনো-সখনো দু'একটা কাগজের অফিস পর্যন্ত পৌঁছোয়। ছাপাও হয়। না-হলে ক্ষতি নেই।

ফেরে সেই রাত ন'টা নাগাদ। বন্ধুরা তখন আড্ডায় জমে থাকে। সেইখানে গিয়ে বসে পশুপতি। সেখানে আসন্ন শনিবারের অতিক্রান্ত দ্বিপ্রহরে অশ্বখুরে ভাগ্যগণনা কিংবা হালফিল রাজনীতির গতিবিধি, নেতাদের সপিণ্ডকরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা উত্তেজিত হয়।

মনে-মনে কোথায় যেন এদের সঙ্গে পার্থক্য অনুভব করে। তবু এসে বসে। পকেটে পয়সা থাকেনা। তাই সিগারেট প্রত্যাশায় উসখুস করে। নিদেন বিড়ি একটা জোটে। সে দিন কার আলোচনা বিয়ে নিয়ে সরগরম ছিল। উৎফুল্ল পশুপতিও সেই আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। সবাই সিগারেট খাচ্ছে। অনেকক্ষণ চা খেয়েছে পশুপতি। সিগারেটের জন্য উসখুস করছিল। অসতর্ক মুহূর্তে অনাদি দত্তর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে বসে। ওর দিকে একবার চেয়ে দেখলো অনাদি। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দিল। খুশি হয়ে প্যাকেট খুলে সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে পশুপতি অগ্নিসংযোগ করে।

কদ্দিন এমনি করে চলবে? মন্তব্য করে অনাদি। প্যালুড্রিনের বড়ির মতো হলদে চোখে ক্রুর একটা কৌতুক। এক মুহূর্তে আবহাওয়া ভারী হয়ে যায়। এধরনের মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না পশুপতি। অসহায় হয়ে চারদিকে তাকালো। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলে থাকে। উত্তর জোগায় না। বোধ হয় ভারী আবহাওয়া হালকা করবার জন্যেই কেউ বলে, পশু তুই একটা বিয়ে কর।

কি খাওয়াবো? ক্লান্ত উত্তর দিল সে।

কেন তোর বৌ রোজগার করে খাওয়াবে! চাকরি-করা বৌ আন।

নির্মম তীরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর উপায় নেই পশুপতির। তবু বলে, হলে তো ভালো হয়, বেঁচে যাই ভাই। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধবে কে?

তুই রাজী থাকিস তো মেয়ে দেখি। হাটখোলার টুনি দত্ত উৎসাহী হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলে।

উত্তর দেয় না পশুপতি।

এমন চেহারা। বিশু গুপ্ত টেনে-টেনে বলে, কোন্ মেয়ের বুকের পাটা রিফিউজ্ করবে!

নির্লজ্জ বিদ্রূপে আহত হলেও পশুপতি হাসি বজায় রাখে। এদের জন্যে মনে অনেকখানি ঘৃণা আছে। আকাঙ্ক্ষাহীন। নিরুত্তাপ মানুষ এরা। অথচ নিজেও এমন নিঃস্ব! অনেক স্বপ্ন চৈত্রের মঞ্জরীর মতো বৈশাখে শূন্য হয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে পশুপতি। আর তার নিরুপায় অক্ষমতাকে বারংবার দংশন করে বন্ধুরা।

পশু মাথার কাছে আয়না নিয়ে শোয়। একজন বুঝি গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে।

আরেক জনের প্রশ্ন, কেন?

রাতে ঘুম ভেঙে আয়নায় মুখ দেখে বুঝতে চায় খোদা ভুলটা শুধরে দিয়ে গেছে কি না!

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

বুঝতে পারে না পশুপতি এর মধ্যে হাসবার কি আছে! পৃথিবী বড়ো নিষ্ঠুর। বাড়িতেও কি শান্তি!

মাসের এক তারিখে একতলার ভাড়াটে-বৌ ভাড়া দিতে এসে পশুপতিকে রক্তাক্ত করে রেখে যায়।

আপনার ছোট ছেলে রোজ দুপুরে ঘুমোয়? সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থেমে যায় মহিলাটি। তারপর আড় চোখে ঘাড় বেঁকিয়ে পশুপতির পড়ে থাকা শরীরটার দিকে চায়।

মা সসঙ্কোচে উত্তর দেন, কি আর করবে?

ওমা! অত বড় বুড়ো ছেলে চাকরি খুঁজতে পারে না? দুপুরে পড়ে-পড়ে ঘুমোয়! খুঁজলে কি আর চাকরি জোটে না!

আরো সঙ্কোচের সঙ্গে মা উত্তর দেন, চেষ্টা তো করছে।

মহিলাটি পুনরায় খড়্গাঘাত করেন, আমাদের রাজু চাকরটাও সেদিন চাকরি নিয়ে ভিলাই চলে গেল! আচ্ছা বলবো 'খন ওঁকে—

পশুপতির মনে তখন এমন সব বাসনার উদয় হয় যার পরিণতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হয়। পাড়ায় কারো জানতে বাকী নেই পশুপতি বেকার। সবাই ওকে এড়িয়ে চলে। শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের অপদার্থ এক অধ্যাপক ওকে আদর করে বাড়িতে ডাকেন। চা খাওয়ান। পৃথিবীর হালচাল নিয়ে আলোচনা করেন। পশুপতির মতামত শোনেন।

সেই একটি জায়গাতে তার মনের কথায় ফুল ধরে। ভাবনাকে হালকা করে।

পৃথিবী থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়েছে পশুপতি। বেঁচে থাকার জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন তার বেশি বাইরে কোথাও নেই। আর এমন সময় ব্যাপারটা ঘটে গেল। মনে-মনে লেখা রইল তার নিমন্ত্রণ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ রেখে

নিমন্ত্রণকে ফুরিয়ে ফেলতে চায় না পশুপতি। ওই একটুকুই তার স্মৃতিতে সকাল বেলার কেতকী আর সন্ধ্যেবেলার চামেলি!

অনেকদিন পরে টিউশনির দৃঢ়মুষ্টি থেকে একটা ছুটির দিন ছিটকে এল। সারাটা দিন বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে পশুপতি। সন্ধ্যের আলোয় ঘুম ভেঙ্গে মনে হল সে যেন পৃথিবীর কেউ নয়! জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আকাশ, নৈঃশব্দ্য, নক্ষত্র অন্ধকার, অপরিচিত রূপকথার মতো পরিচিত ঘরবাড়ি, মনের ভাবনা, কলে জল পড়ার মিষ্টি শব্দ, চিমনির লম্বাটে আকার, ধূসর ধোঁয়ার রেখা সব মিলে মনের মধ্যে এক প্রসন্নতা জমে উঠল।

দেরি করে না পশুপতি। রাস্তায় চা খাবে। এই ভেবে জামা কাপড় পরে বাইরে নেমে গেল। তারপর কুড়ি নম্বর ট্রাম ধরে মৌলালির চৌমোহানী পেরিয়ে নোনাতলার ট্রাম ডিপো বাঁয়ে রেখে পার্ক সাকাসের সীমানায় পৌঁছে গেল। শ্লথ গতিতে রাস্তা পার হল। ছোট দোকানটার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। যাক, খোলাই আছে। জড়ানো পায়ে এগিয়ে যায় পশুপতি। দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দোকানে একজন খদ্দের আছে। একটু অপেক্ষা করে পশুপতি। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটি ফুল নিয়ে নেমে এল। তারপর দোকানের ভেতর উঠে পশুপতি। মেয়েটি পাশ ফিরে কি যেন করছিল। সিগারেটের গন্ধে মুখ ফেরালো, কি চাই?

আমি, সামনে এগিয়ে যায় পশুপতি। মুখে হাসি। (যদিও মেয়েটি দেখতে পাচ্ছে না!)

আমি কে?

আমি প—, জিভটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে পশুপতি। তারপর আলগা করে দিয়ে বলে, আকাশকুসুম—একটু থামে, আবার বলে, আকাশকুসুম রায়।

আসুন আসুন। সাদর অভ্যর্থনা করে মেয়েটি, অনেকদিন

আপনার কথা ভেবেছি। তারপর মনে হয়েছে ভুলে গেছেন। এতদিনে মনে পড়লো!

অনেক দিনই পড়েছে। খুসিতে ঝকমক করে পশুপতি, এলে তো একদিনেই ফুরিয়ে যাবে। তাই কৃপনের সঞ্চয়ের মতো জমিয়ে রেখেছিলাম।

তাব মানে? চেয়ার এগিয়ে দিল মেয়েটি পশুপতি দিকে, বসুন। আমার জন্যে আপনাকে যেদিন কতো কষ্ট পেতে হল!

এরকম অসুবিধে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে জানিনে। সিগারেটে টান দিল পশুপতি। দোকানের মধ্যে গভীর প্রশান্তি। নিজের যা কিছু অক্ষমতা সে সব বুঝি দোকানের বাইরে রেখে এসেছে।

আপনার দোকান দেখে খুব আশ্চর্য লাগে! বলল পশুপতি।

কেন?

এমন জায়গায় কারা ফুল কিনে কাব্য করতে আসে জানিনে!

ও। মেয়েটি মিষ্টি শব্দ করল, মৃত প্রিয়জনের স্মৃতিতে দেবার জন্যে—

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। কথার মাঝখানে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল পশুপতি। সামনে রাস্তার ওপাশে সমাধি চত্বরের ওপব চোখ পড়ল, আপনারা বুঝি খ্রীষ্টান?

তাই বোধ হয়।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় পশুপতি। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, বোধহয় কেন?

ঠিক জানিনে তাই।

হঠাৎ খেয়াল হল পশুপতির সিগারেটের গন্ধে মেয়েটির অসুবিধা হতে পারে। তাই ব্যস্ত হয়ে সিগারেট বাইরে ফেলে দিয়ে এল। তারপর বসতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নামটা জানা হয়নি কিন্তু!

সুমিতা সিংহ। একটু থেমে বলে সে, আমি বলি। আসলে আমার নাম মরিন সুমিতা সিংহ।

রোজই বসতে হয় নাকি আপনাকে ?

আপাতত রোজই। মা অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমাকেই বসতে হচ্ছে। অনেক বয়েস হয়ে গেছে। আর বোধ হয় সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারবেন না।

দিনের আলো ক্রমশ ধূসর হয়ে এল।

পশুপতি তন্ময় হয়ে দেখে। একরাশ কালো চুল মাথার ওপর ছড়িয়ে আছে। আয়ত শান্ত দৃষ্টিহীন চোখে উজ্জ্বল ব্যঞ্জনা। কী রকম একটা আশ্চর্য অনুভব পশুপতিকে ঘিরে ধরে। সময়টা হেমন্ত। উত্তুরে বাতাসে বেহালায় ছড় টানা সুরু হয়ে গেছে। অথচ খুব স্পষ্ট নয় এমন বসন্তের অনুভব ক্রমশ শরীরী হয়ে উঠছে পশুপতির মনে।

যে-সব কথা বলবে বলে ঠিক করে এসেছিল পশুপতি—সব যেন গুলিয়ে গেল। হঠাৎ নিজেই বলে বসে, আজ আসি—

এরই মধ্যে উঠবেন ? মেয়েটির গলায় যেন বিষণ্ণতা। কবে আসছেন ?

আপনি বললেই আসবো। উত্তর দিল পশুপতি।

মাঝে মাঝে আসুন না। চোখে দেখি না ব'ল আমরা কি পৃথিবীর কেউ নই!

আসবো। নিশ্চয়ই আসবো। শেষের শব্দ ছুটোতে পশুপতি অস্বাভাবিক জোর দিল।

কয়েক দিনের মধ্যে পশুপতি আবার এল। সে যে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারে, নির্জনতা ভালবাসে, কখনো কবিতা লেখে এগুলো সুমিতার কাছে আলগোছে বলে ফেললো।

সুমিতাও ওর কাছে অনেকখানি আলগা করে দিল। ছুজনে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পৃথিবীর অনেকখানি সুমিতার নেপথ্যে ছিল। সেই শূন্যটুকু পশুপতি পূর্ণ করে দিল।

সন্ধ্যার টিউসনিটা দুপুরের দিকে সরিয়ে নিল। সারাদিন সন্ধ্যার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। কখন সন্ধ্যা হবে। সুমিতার সঙ্গে দেখা হবে।

নিজের চেহারা ও অক্ষমতা সম্পর্কে পশুপতির এতদিন যে হীনমন্যতা বোধ ছিল এই অন্ধ মেয়েটির কাছে এসে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিপূর্ণ মানুষ মনে হল নিজেকে। অকর্মণ্যতার যে গ্লানি তাকে জড়িয়ে ছিল ঝেড়ে ফেলে দিল। নতুন উৎসাহে চাকরির খোঁজে নামলো। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি সুরু করলো।

একদিন সুমিতা বলল, মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে আকাশ। যাবে আমাদের বাড়ি?

কেন যাবো না!

পৃথিবীকে গুটিয়ে নিয়ে এল পশুপতি। এখন সুমিতাকে নিয়ে অন্য এক স্বপ্নের মৌচাকে মধু জমাচ্ছে।

এই ভালো। এই ভালো। পুরোন পৃথিবী আর তার দেওয়া যা-কিছু অবিচার সব ফেলে সরে যেতে চায় পশুপতি। ওরা ওদের মতো থাক। ওদের থেকে সরে গিয়ে—ওদের থেকে দূরে গিয়ে বাঁচতে চায় পশুপতি।

একদিন সুমিতাদের বাড়ি গেল পশুপতি। সুমিতাই ওকে নিয়ে গেল। দোকান বন্ধ করে পশুপতির হাত ধরলো সুমিতা, চলো—

মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সুমিতা। মেয়ের সঙ্গে চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। রুগ্না মহিলা শুয়ে ছিলেন।

সুমিতা পরিচয় করিয়ে দিল, এই সেই আকাশ। এর কথাই তোমাকে বলি।

চেয়ার এগিয়ে দিল সুমিতা। পশুপতি বসলো।

ভদ্রমহিলা বললেন, বোস বাবা বোস—

সুমিতা চা আনে। ভদ্রমহিলা পশুপতির পরিচয় নিলেন।

একটা জায়গায় মিথ্যে বলতে হল পশুপতিকে, হ্যাঁ চাকরি করি।

মাঝে-মাঝে এসো। শুয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা, আমি মরে যাবার পর কি যে হবে মরিনের!

তুমি ও ঘরে চলো আকাশ—

নিজের ঘরে নিয়ে বসালো সুমিতা। তাঞ্জোরের নক্ষত্রখচিত পুষ্পপাত্রে একগুচ্ছ বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকার কোরক। সে দিকে তাকিয়ে পশুপতি বললো, তুমি তো ওদের দেখতে পাও না!

তা' পাইনে। কিন্তু অনুভবে ওরা সত্যি হয়ে আছে। ওরা ঘরে থাকলে ভালো মন থাকে। দুজনের অকারণ কথায় রাত হয়ে গেল। পশুপতিরও খেয়াল নেই! ঘড়ির কাঁটার হাত দশটার সীমানা কখন ছাড়িয়ে গেছে।

কাল আসছো তো?

এর পর রোজ আসতে শুরু করে পশুপতি। একদিন বলে, চলো সুমি আজ একটু ঘুরে আসি—

সন্ধ্যের আগে দোকান বন্ধ করে সুমিতা ওদের চাকরের হাতে চাবি দিয়ে বললো, মাকে বলবি একটু বাদে আমি যাচ্ছি—

ততদিনে বসন্ত শেষ হয়ে এসেছে। ধর্মতলায় গে[illegible]মোরের ফুল না এলেও পার্কসার্কাসে কৃষ্ণচূড়ার আঙুলগুলো কোমল লাল ফুলের মঞ্জরীতে ভরে উঠেছে।

বাইশ কি চব্বিশ বসন্তের কোন মেয়েকে নিয়ে পথে বেরুন পশুপতির এই প্রথম। বেড়াতে বেরিয়ে গাছপালার অন্ধকারে লোকবিরল পথের নির্জনে পশুপতি সুমিতার মনের খুব কাছাকাছি এল।

পশুপতি বলে, আমি কুৎসিৎ।

সুমিতা উত্তর দেয়, সে তো তুমি বাইরে। যেখানে অনুভবের সেখানে তুমি কতো সুন্দর!

আমার অনেক ত্রুটি, অনেক অক্ষমতা—

সে তোমার নিজের কাছে।

সুমিতার এলোমেলো খোঁপার নীচে অর্ধস্ফুট একটি ব্ল্যাক-প্রিন্সের কোরক। পশুপতি পরিয়ে দিয়েছে।

নিজের মনে কথা বলে সুমিতা। ওর সঙ্গে পাল্লা দেয় পশুপতি। দুজনেই খোলা হাওয়ায় কথার পাল তোলে।

পশুপতি বলে, জানো সুমি, নাবিক হওয়ার সাধ ছিল আমার—

ক্যাথিড্রাল রোডের পথ ধরে হাঁটে ওরা। ডালপালায় অযাচিত গানের বিহ্বল প্রহর। সুমিতার সোনালি কাজকরা সুরাটের কাপড়ের আকাশ ছুঁয়ে বাতাস উধাও হয়ে যাচ্ছে। সুমিতার হাত পশুপতির হাতের মধ্যে ধরা আছে।

তখন সন্ধ্যার আকাশ। রঙের আকাশ। হিজিবিজি জলছবি মেঘের আকাশ।

কেন ?

মনে হয়েছিল, যৌবনের ব্যর্থ খরচ থেকে বাঁচি। তারপর সুমিতাকে বলে পশুপতি, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বুঝতে পারছি।

কি করে ?

পাখিদের কথা শুনে।

হাসলো পশুপতি, এসো এইখানে বসি।

শহরের মাঝখানে অন্তরীন নির্জনতায় দুজনে দুজনের পিঠে পিঠ দিয়ে বসলো।

বিকেলটা ভারি সুন্দর। কথা শুরু করে পশুপতি।

কি রকম সুন্দর ? প্রশ্ন করে সুমিতা।

একগুচ্ছ বাবলা ফুলের মতো সুন্দর।

বাবলার ফুল কেমন ?

মিহি আর মসৃণ হলুদ রঙের।

বিকেল বেলা, হলুদ রঙ কিছুই চোখে দেখিনি। আমার বড়ো দুঃখ আকাশ।

সুমিতা ঘুরে পশুপতির মুখোমুখি বসে।

দূর থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের উচ্চকিত শব্দের বেগ, ট্রামের মৃদু ঘর্ঘর, ছত্রোভঙ্গ মানুষের সংলাপ হেঁটে আসে।

সুমি।

বলো!

আমার কি আশ্চর্য ভালো লাগছে!

কেন?

তুমি আছো বলে।

আমি কি?

তুমিই সব। কাব্য করে বলি, তুমি আশ্বিনের ভ্রমর, চৈত্রের মায়াবতী মেঘ, হেমন্তের রৌদ্রের রঙ—

কি যে বাজে বকো! হাত ধরে সুমিতা, আমাকে অমন বেশি করে দেখো না। আমি সামান্য! ভয় করে!

সুমিতার হাত ধরে থাকে পশুপতি। ছাড়ে না। বলে, অন্ধকারে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

আজ চাঁদ উঠবে না?

কি জানি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে। আবার নিস্তব্ধতা ভাঙে পশুপতি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—যদিও জানি—তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

বলো।

তুমি আমার হবে তো? সুমিতার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় পশুপতি!

মাথা নিচু করে বসে থাকে সুমিতা। খোঁপার ফুল বাতাসে কাঁপে।

হঠাৎ পশুপতির হাতের ওপর জল ঝরে পড়লো, কাঁদছ ?

হ্যাঁ, কাঁদছি। সুমিতা উত্তর দেয়।

কেন ?

কি জানি এমনি কান্না এল।

সেদিন দেরি করে বাড়ি ফেরে সুমিতা। দরজায় পেঁাছে দিয়ে গেল পশুপতি। একটু রাত হয়েছিল। এস্‌প্ল্যানেডের একটা দোকানে গিয়ে দিলদরিয়া মেজাজে খরচ করলো পশুপতি অনেকদিনের রেস্ত ভেঙে।

সুমিতার মা জেগে ছিলেন। বললেন, এত রাত করে ফিরলি বাছা ?

হ্যাঁ মা, একটু রাত হয়ে গেল। তুমি রাগ করো নি তো ?

আকাশ পেঁাছে দিয়ে গেল বুঝি ?

হ্যাঁ, নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল সুমিতা।

শুনে যা। কাছে আয়।

সুমিতা মায়ের বিছানায় গিয়ে বসলো।

আজ যোসেফ এসেছিল। ওকে কিছু বলতে হয়—

বাঃ, আমি কি বলবো।

তুই বলবি নে তো কে বলবে ? ও আফ্রিকায় নতুন একটা সার্ভিসে জয়েন করতে যাচ্ছে—

জানিনে, যাও। মুখ ফিরিয়ে নিলো সুমিতা! পশুপতি হাতের স্পর্শ তখনো তার হাতে লেগে। সুমিতার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোর সুখে আমার আপত্তি নেই কিন্তু বাধা যে কতো সে তো তুই জানিস! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, আমি বেশী দিন নেই সেই জন্যেই এত ভাবনা।

কোন উত্তর দিল না সুমিতা।

তা ছাড়া তোর সম্পর্কে সবই বলেছি।

দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেল সুমিতা।

আরো কিছুদিন বাদে এক রবিবার। দশ নম্বর বাসে করে ওরা মৌলালি এসে নামলো।

তারপর পিছিয়ে কনভেণ্ট পার্কে গিয়ে বসে। এমনিতেই পার্কে লোক থাকে না। তার ওপর বৃষ্টির দিন বলে লোক আরো কম।

পার্কে বসে সুমিতা বললো, কি বলবে বলছিলে বলো—

সোমবার চাকরিতে জয়েন করছি।

তার মানে?

জীবনে এই প্রথম চাকরি পেলাম তুর্গাপুরে। তোমাকে মিথ্যে বলেছি।

তু—র্গা—পু—র। ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে সুমিতা। রোজ তা'হলে আমাদের দেখা হবে না?

শনি আর রবিবার বাধা রইলো না।

সুমিতা চুপ করে থাকে।

উঃ, কি কালো মেঘ করছে!

তাই নাকি? অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করে সুমিতা।

পুব হাওয়াতে বুঝতে পারছ না! আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে সুমি।

সুমিতা বলে, শোনাও না—

ভাবছি কি শোনাই—'অশ্রুভরা বেদনা' না 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি'—

সুমিতা মৃদুকণ্ঠে বলে, তোমার যেটা ভালো লাগে—

প্রথমে গুনগুন করে তারপর গলা ছাড়ে পশুপতি।

গান শেষ হতে সুমিতা বলে, এত ভালো তুমি গাইতে পারো আমাকে তো বলো নি আকাশ। ভারি তুষ্টু তুমি!

পশুপতি উত্তর দিল, এমন একটা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরতাম আমার ভালোলাগা আর ভালোবাসার কোন খবর তোমাকে দিতে পারিনি।

বৃষ্টি এলো নাকি! গায়ে জল পড়লো যেন!

হ্যাঁ, মেঘ কালো হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়ায় পশুপতি, চলো গাছের নিচে টালির ঘরে গিয়ে দাঁড়াই গে।

ওরা উঠতে-না-উঠতে বৃষ্টি ঝেঁপে এল। কোন রকমে টালির শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো দুজনে। কাছাকাছি।

বৃষ্টির চিকের ওপাশে মাঠ ঢাকা পড়ে গেছে।

সময়টা বড়ো অদ্ভুত। তুমি আর আমি ছাড়া মাঠে কেউ নেই সুমি।

একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে?

না, একেবারে অন্ধকার হয়নি। তোমার খোঁপায় গোঁজা বাসন্তী রঙের পোর্টুলেকা ফুলগুলো এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আমার মুখ?

সে তো অন্ধকারেও দেখি।

তোমার হাত দাও আকাশ। পশুপতির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সুমিতা বলে, তুমি আমার আকাশ। একটু থেমে বললো, আকাশকুসুম।

হেসে ওঠে পশুপতি।

পশুপতির গা-ঘেঁষে দাঁড়ায় সুমিতা। তারপর তার হাত ধরে বলে, এমন সময়! কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অনেকক্ষণ ধরে জল পড়লো। পাতা নড়লো।

এক সময় পশুপতি সুমিতাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তোমার আপত্তি নেই তো?

কি বললো সুমিতা বোঝা গেল না।

পশুপতি বলে, প্রথম স্মৃতি হয়ে থাক।

সুমিতা বাধা দিল না।

আজ সারাদিন মনে-মনে তোমার কথাই ভেবেছি। পশুপতি ফিসফিস করে।

কেন?

কি যেন বলতে চাই।

বলো না। আবদার করে সুমিতা।

ভারি লজ্জা করছে।

লজ্জা!

হ্যাঁ

আমাকে লজ্জা!

সত্যি। অথচ না বললে নয়। তুমি হয়তো ছেলেমানুষি ভাববে। তুর্গাপুরে যাবার আগে জেনে যেতে চাই।

তুমি ভারি ইয়ে। ঠোঁট ওলটালো সুমিতা, বলবো বলছো অথচ বলছো না!

বলবো?

বলছি তো মশাই—

তোমাকে তুর্গাপুর নিয়ে যেতে চাই! অবশ্য তার আগে কোলকাতায় রেজিস্ট্রি করে নেব।

সুমিতা উত্তর দিল না।

কথা বলছ না যে?

আমি কি বলবো!

তোমার আপত্তি না-থাকলে সামনের সপ্তাহে ··সে রেজিষ্ট্রি করে নিতে চাই।

কেউ জানবে না?

না, বিয়ে হয়ে যাবার পর সবাই জানবে। অবশ্য মেয়েরা ঘটা করে বিয়ের কথা সবাইকে জানাতে চায়। তুমি দুঃখ পাবে জানি।

দুঃখ সে জন্যে নয়। তোমাকে সব বলা হয়নি!

সব কথা কি—তোমার আপত্তি?

আপত্তি। এই শব্দটায় থমকে দাঁড়ালো সুমিতা, আপত্তি নয়। এত সুখ প্রার্থনাও করিনি! আমি অন্ধ। আলো থেকে সহজ জীবন

থেকে অনেক দূরে ছিলাম। তুমি আমাকে যা দিয়েছ সাধ মিটিয়েও অনেকখানি থেকে যায়। তবু—

বলো।

চুপ করে রইলো সুমিত্রা। অনেকক্ষণ বাদে বললো, আমার নিজের লজ্জার কথা—

এইখানে বসে শোনা যাক। ঘরের ভিতরে একটা বেঞ্চিতে দুজনে বসে।

আমার চেহারায় তুমি দেখেছ, ভিনদেশি একটা সাদৃশ্য ছাপা হয়ে আছে। ও ছাপটা আমার বাবার মুখের, শুনেছি তিনি নাকি নেপালের রানা বংশের ছেলে। কাজকর্ম হোক আর পড়াশুনোই হোক যে কোন কারণে কোলকাতায় থাকতেন। নেপালে তখন রানাদের সঙ্গে প্রজাদের গোলমাল জট পাকিয়ে উঠেছে।

সিগারেট ধরালো পশুপতি।

দেশলাইয়ের শব্দে থেমে গেছিল সুমিত্রা। বললো, বলি ?

বলো।

গোলমালের জন্যে ওখানকার টাকার স্রোতে ভাঁটা পড়ে। বাবাকে নিজের অন্ন নিজেই খোঁজ করে নিতে হচ্ছিল। এমনি সময় মায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয়। কোথায়, আর কি করে সেটা আমার জানা নেই। মা মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু ঘরের বিধবা মেয়ে। অভাবের সংসার। রোজগারের জন্যে তাকেও পথে বের হতে হয়েছিল। মা নার্সিং করতেন। দুজনের ঘনিষ্ঠতা হল। ঘর ছাড়লেন মা। বিয়ে না-করেই ঘর বেঁধেছিলেন কোলকাতার সহরতলিতে। বাবা বোধহয় মাকে আশা দিয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠতার ফলে যা হয়—অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রইল সুমিত্রা। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে বল্লল, আমার নিজের দরকারেই তোমাকে বল্‌তে হবে। মা যখন আসন্ন-প্রসবা বাবা একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। বাবার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মা তত দিনে মিসেস রাণা বলে

পরিচিত হয়ে গেছেন! লজ্জায় আর ক্ষোভে তিনি পরিচিতদের এড়িয়ে গেলেন। তারপর আমি পৃথিবীতে এলাম। মা আমাকে বোধহয় পথেই ফেলে দিতেন কি-ভেবে শেষে খ্রীষ্টান মিশনের হোমে রেখে গেলেন। তার এক বান্ধবীর কাছে। তিনি আমাকে পালন করেছেন। তারপর মায়ের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুমিতা, জানিনা তিনি বেঁচে আছেন কি না।

অনেকক্ষণ পশুপতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো।

হাসছো যে?

হাসবো না? মানুষের ইচ্ছের সোজা পথে বিধাতা তার অনিচ্ছের পাঁচিল চাপিয়ে দেন। তাতে ইচ্ছেটা আরো প্রবল হয়ে ওঠে।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। সুমিতাও স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল।

কি কথা বলছ না যে?

এবার তুমি বল। উত্তর দিল সুমিতা।

আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি।

যাবার আগের দিন পশুপতি সুমিতার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বলে এল, তোমার কাছে আমার হৃদয়কে রেখে গেলাম। প্রত্যেক শনিবার একটা করে চিঠি পাবে।

সুমিতার কাছ থেকে বিদায়-নেওয়া বিকেল বকুলগন্ধ হয়ে রইলো।

নতুন কাজে যোগ দিলো পশুপতি। ল্যাবোরেটারী এ্যাসিস্টান্ট। সকাল আটটায় অফিসে যেতে হয়। দুপুরে একঘণ্টা টিফিন। সেই পাঁচটায় ছুটি। তারপরও দু'টো ওভারটাইম। শনি ও রবিবার পুরোদিন। সারাদিনে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

সারা সপ্তাহ কাজ বুঝে নিতে কেটে গেল। শনিবারের নিঃসঙ্গ

বিকেলের দিকে বিভ্রান্ত নাবিকের মতো তাকিয়ে থাকে পশুপতি। সোমবার গড়িয়ে শনিবার এলো। শুনলো এখানে শনি-রবি একাকার। কারো ছুটি নেই। নতুন কারখানা। তার ওপর জরুরী অবস্থা। নতুন এসে কাউকে ছুটির কথা বলতে পারলো না পশুপতি। রবিবারেও বের হতে হবে। সন্ধ্যায় মেসে এসে ঝিমিয়ে রইলো। মনে হল এ কোন স্বাদহীন বর্ণহীন জীবন। সুমিতার চিন্তা যন্ত্রণার মতো আচ্ছন্ন করে থাকে। কখন রাতে মেসের ঠাকুর খেতে ডাক দিল। আর খেয়ে এসে বিছানায় ডুব দিল। দু'চার জন আলাপ করতে এসে বুঝে গেল ছেলেটা মোটেই আলাপী নয়।

ঘুমে-জাগরণে রবিবার রাতটা পার হয়ে গেল। সোমবার সকালে চাঙ্গা হয়ে ওঠে পশুপতি। এতক্ষণ পরে মনে হল শনিবার মাসে অন্তত চারটে আসে। কোন মাসে পাঁচটাও। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে-মনে ঠিক করে সামনের শনিবার উপর-ওয়ালার কাছ থেকে ছুটি নেবে। ওভারটাইমের দরকার নেই। সময়ের সবটুকু মেফিস্টোফেলিসের কাছে বিক্রি করে দিতে চায় না।

এক শনিবার সকালে বুকে সাহস জোগাড় করে সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠলো। উপরওয়ালা ওরই বয়সী একজন। দেখতেও ভারী গম্ভীর, মনে হয়েছিল অবাঙ্গালী। কিন্তু পশুপতিকে দেখে হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, বসুন, বলুন কি ব্যাপার?

পশুপতি দাঁড়িয়েই বললো, বলছিলাম—

বলুন—

ওভারটাইম আমি করতে চাই না।

তার মানে?

শনিবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ছুটি চাই।

মিষ্টার চৌধুরী হাসলেন, এখন প্রয়োজনের সময়। ছুটির কথা ভাববেন না। আপনার প্রয়োজন ছুটি। দেশে চায় কাজ।

তবু—

না, তবু নয় মিষ্টার রায়! নতুন কাজে এসেছেন এখুনি ব্যতিক্রম হওয়া সমীচীন নয়। আমার মনে হয় হয় অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌ এ ব্যাপারটা খুব সুনজরে দেখবে না। ছুটির কথা এখন ভাববেন না।

বিশেষ দরকার—

চাকরি পাওয়া যেমন কঠিন যাওয়াটা কিন্তু—

সবটা শুনতে পারলো না পশুপতি। কতো তপস্যার পর চাকরি। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। দারুণ একটা আতঙ্ক অশরীরী হয়ে তাকে ঘিরে ফেলে। না। না-না। চাকরি যাবার কথা ভাবতেও পারে না।

ছুটির পর মেসে এসে চিঠি লিখল সুমিতাকে: এখানে শনি-রবি একাকার। কয়েকদিনের মধ্যে সুবিধে করে যাবো!

চিঠি পাঠিয়ে চিঠির প্রত্যাশায় রইলো পশুপতি। নিজের ওপর রাগ হয়। ভীরু! ভীরু! ভীরু সে! চাকরিটা ছেড়ে দিতেও পারছে না। অবশ্য চাকরি ছাড়বার কথা ভাবলে শরীর হিম হয়ে আসে। অথচ চাকরি কি সুমিতার চেয়ে বড়ো!

দারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি পড়ে কি রকম একটা মানসিক বিকার অনুভব হয়। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়ে ফুঁসে ওঠে।

জানালার কাছে মাথা রেখে অন্ধকারে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে পশুপতি। কোথায় শহর কোলকাতা! সে যেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ময়নামতীর হাট ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে। সেখানে তার মনের রাজকন্যা। এখন যেন অলৌকিক মনে হয়।

নাসিরুদ্দিন রোডের সেই দোতলা বাড়িটায় সুমিতাও কি পশুপতির কথা এমনি করে ভাবছে।

হঠাৎ একদিন চিঠি এল একটা। সে চিঠি যে সুমিতার কি করে যেন বুঝতে পেরেছিল পশুপতি। সাধারণ কাগজের গন্ধ

সুগন্ধ মনে হল তার। চিঠি নয় চিরকুট। কাকে দিয়ে (
লিখিয়েছে: তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে নিয়ে যাও—

গুটিকয়েক শব্দ। ওরি মধ্যে যন্ত্রণা যেন দানা বেঁধে ত
অস্ফুট শব্দ করলো পশুপতি। এখনি এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছে ক
কলকাতায়। অথচ কাজের চাপে বাঁধা। হৃদয়ের যন্ত্রণাকে
করে নেভায়। ঝরে থাকা একমুঠো জুঁইয়ের মতো সেই দি.
স্মৃতি যেন আরো যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

তড়িৎ ট্রেনের পথ ধরে আরো ত্বরিৎ মন এগিয়ে যায় বিকা
আলো-লেখা সেই সব দিনের কাছাকাছি। কোথায় কত ,
সুমিতা! চোখ বুজে অনুভব করে সুমিতার ভিজে অথচ খস-
চুলের সৌগন্ধ্য বাতাসে এক ঝাঁক মৌমাছির মত খেলছে।

এখানে এই যন্ত্রের সহরে বিরাট টিনের শেড ড্রাগনের
হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ওর জঠর মানুষের সময় সাম
আর আকাঙ্ক্ষা নিঙড়ে দিনান্তে আচ্ছন্ন একটা পিণ্ড বের করে দে

অথচ সুমিতাকে কথা দিয়ে এসেছিল প্রত্যেক শনি
কলকাতায় যাবে। সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখবে।
কথাই রাখতে পারেনি। নিজের উপর নৃশংস হয়ে ওঠে পশু

রাত্রিটা কোনমতে পার করে দিল। সকালে উঠে কাগজ
রেজিগ্‌নেশন্ লেটার লিখে স্বস্তি পেল। তারপর জিনিসপত্র ও
মেস থেকে বেরিয়ে পড়ে। অন্তত ষ্টেশনে গিয়ে হাজির না-
পর্যন্ত নিজেকে বিশ্বাস নেই। আর বিশ্বাস করেই বা কি
আড়াই মাস হয়ে গেল তবু সুমিতাকে না-দেখে তো বেঁচে আ

দুপুরে কলকাতায় এসে নামে পশুপতি। হাওড়া থেকে
নিয়ে সোজা নসিরুদ্দিন রোডের দিকে এগিয়ে যায়। চাকরি ছাড়
জন্য এতটুকু দুঃখ নেই।

সার্কাস এভিনিউ হয়ে নাসিরুদ্দিন রোডের সেই বাড়ি